বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম

ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী

১ম সংঘরাজ মহামান্য সারমেধ মহাথেরো

থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম বিকাশে বাঙ্গালীর সূর্য সন্তান, বৌদ্ধ কুলরবি মহামান্য সংঘরাজগণের পুণ্যস্মৃতি স্মরণে-

প্রথম সংঘরাজ
সারমেধ মহাথেরো

দ্বিতীয় সংঘরাজ পূর্ণাচার
ধর্মধারী চন্দ্রমোহন মহাথেরো

তৃতীয় সংঘরাজ
জ্ঞানালংকার মহাথেরো

চতুর্থ সংঘরাজ শাসনধ্বজ
বরজ্ঞান মহাথেরো

পঞ্চম সংঘরাজ
তেজবন্ত মহাথেরো

ষষ্ঠ সংঘরাজ কর্মযোগী
ধর্মানন্দ মহাথেরো

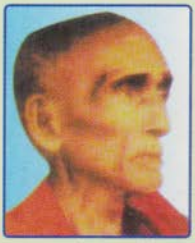

সপ্তম সংঘরাজ
অভয়তিষ্য মহাথেরো

অষ্টম সংঘরাজ সাহিত্যরত্ন
শীলালংকার মহাথেরো

নবম সংঘরাজ
নাগসেন মহাথেরো (মরণোত্তর)

দশম সংঘরাজ পণ্ডিত
জ্যোতিঃপাল মহাথেরো

একাদশ সংঘরাজ
শাসনশ্রী মহাথেরো

থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম বিকাশে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কিংবদন্তী বাঙালী বৌদ্ধ সংঘ মনীষা, আলোকিত সদ্ধর্মাচার্য, কালজয়ী জীবিত পঞ্চ রত্নের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি-

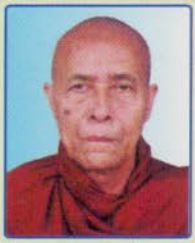

মহামান্য সংঘরাজ ড. ধর্মসেন মহাথেরো, পটিয়া উপজেলার অন্তর্গত উনাইনপুরা গ্রামে আষাঢ় মাস ১৩৩৫ বাংলা, ১৭ জুন ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ রবিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭ আশ্বিন ১৩৫৪ বাংলা, ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে উপসম্পদা লাভ করেন। তিনি বর্তমানে পটিয়া উনাইনপুরা লঙ্কারাম বিহারের বিহারাধ্যক্ষ। **তথ্যসংগ্রহ :** মহাজ্ঞানী মহাজন গ্রন্থ হতে সংকলিত।

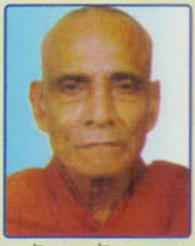

মহামান্য উপ- সংঘরাজ ড. জ্ঞানশ্রী মহাথেরো চট্টগ্রাম জেলাস্থ রাউজান উপজেলার পূর্বগুজরা'র অন্তর্গত ডোমখালী গ্রামে ১৩৩২ বাংলা ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৩৫৬ বাংলা ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে উপসম্পদা লাভ করেন। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ। **তথ্য সংগ্রহ:** হীরক জয়ন্তী স্মারক।

স্মৃতিধর শ্রদ্ধেয় শীলানন্দ মহাথেরো চট্টগ্রাম জেলাস্থ রাউজান উপজেলার অন্তর্গত রাউজান গ্রামে ৯ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১২ কার্তিক, ১৩৫৭ বাংলা, ২৯ অক্টোবর ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার দিবা ১০টার সময় উপসম্পদা লাভ করেন। তিনি বর্তমানে রাউজান আনন্দ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ। **তথ্য সংগ্রহ :** রাউজান আনন্দ বিহারে ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে পবিত্র ভিক্ষু পরিবাস এবং মহাস্থবির বরণ উৎসবে প্রয়াত ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া সম্পাদিত এবং ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রীর স্মরণিকা গ্রন্থ হতে সংকলিত।

বিনয়াচর্য্য পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথেরো একুশে পদক প্রাপ্ত-২০১৫ খ্রীঃ কক্সবাজার জেলাধীন রামু উপজেলার অন্তর্গত মেরেংলোয়া গ্রামে ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ বাংলা, ১০ জুন ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কার্তিক মাস ১৩৫৭ বাংলা, নভেম্বর মাস ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ, দিবা ১.৫০ মিনিটে উপসম্পদা লাভ করেন। তিনি বর্তমানে রামু সীমা বিহারের বিহারাধ্যক্ষ। **তথ্য সংগ্রহ:** বিনয়াচর্য্য পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথেরো'র ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত অভিধর্মাথ সংগ্রহ স্বরূপ দীপনী গ্রন্থে প্রয়াত ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়ার লেখ গ্রন্থ হতে সংকলিত।

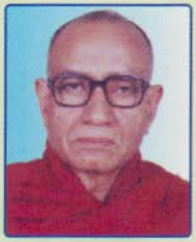

শাসনস্তম্ভ, বিচিত্র ধর্মকথিক শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রিয় মহাথেরো চট্টগ্রাম জেলাস্থ হাটহাজারী উপজেলার অন্তর্গত মির্জাপুর গ্রামে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে উপসম্পদা লাভ করেন। তিনি বর্তমানে মহামুনি পাহাড়তলী মহানন্দ সংঘররাজ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ।

শ্রদ্ধেয় ভন্তেদের নিরোগ ও দীর্ঘ জীবন কামনায় গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হল।

শ্রদ্ধান্তে- সম্পাদক ও প্রকাশক

সম্পাদক ও প্রকাশকদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ থেরো (এম.এ), পিতা : সুনীল বড়ুয়া, মাতা : আলো বড়ুয়া, ১২ ভাদ্র ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, ২৭ আগষ্ট ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ, শনিবারে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাঙ্গুনিয়া উপজেলার উত্তর পদুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভদন্ত লোকানন্দ মহাথেরো'র কাছ থেকে ১৬ জুলাই ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে উপসম্পদা লাভ করেন। তিনি রাঙ্গুনিয়া সংঘরাজ ভিক্ষু সমিতির কার্যকরী সদস্য, রাঙ্গুনীয়া ত্রিপিটক শিক্ষা পরিষদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার ভিক্ষু সমিতির সহ-সভাপতি এবং বর্তমানে বড়হাতিয়া বোধিনিকেতন বিহারের বিহারাধ্যক্ষ। ভিক্ষু সমাজের যে কয়জন তরুণ ব্যক্তিত্ব স্বীয় শীলগুণে নিজেকে বিভূষিত করে ভিক্ষু জীবন-যাপন করছেন তাঁদের মধ্যে এই গ্রন্থের পুনঃ প্রকাশক শ্রদ্ধেয় ভন্তে অন্যতম। বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ নিজে জানার এবং অপরকে জানানোর জন্য উনার যে প্রচেষ্টা তা প্রশংসনীয়। সেই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় **"বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম"** নামক অমূল্য গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ করে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করছেন।

শ্রীমৎ সুমনোপ্রিয় থেরো, পিতা : প্রয়াত সুনীল কান্তি বড়ুয়া, মাতা : কানন বালা বড়ুয়া, ১১ মার্চ ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার অন্তর্গত দরদরী হৃদয় মাষ্টার বড়ুয়া পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিচিত্র ধর্মকথিক, শাসনস্তম্ভ ভদন্ত ধর্মপ্রিয় মহাথেরো'র কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে এবং ২১ জুলাই ২০০২ খ্রীস্টাব্দ, ০৬ শ্রাবণ ১৪০৯ বঙ্গাব্দে উপসম্পদা লাভ করেন। তিনি বর্তমানে সংঘরাজ ভিক্ষু মহামন্ডলের সহ-হিসাব পরীক্ষক এবং রাউজানের পশ্চিম গহিরা শান্তিময় বিহারের বিহারাধ্যক্ষ। শ্রদ্ধেয় ভন্তে বৌদ্ধ সমাজের তরুণ ভিক্ষুদের মধ্যে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি পূর্বেও কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনা করে বৌদ্ধ সমাজের প্রশংসা কুড়িয়েছেন এবং বৌদ্ধ সমাজের অনেক কল্যাণ সাধন করেছেন। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় বিভিন্ন গভীর তত্ত্বমূলক বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনা করে সুশীল সমাজের প্রশংসার দাবিদার হয়েছেন, সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমানেও প্রয়াত শীলাচার শাস্ত্রী মহোদয়ের **"বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম"** গ্রন্থটি পুনঃ সম্পাদন এবং প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে ইতিহাস বিস্মৃত বৌদ্ধ জাতিকে তার অতীত ইতিহাস জানার সুযোগ করে দিয়েছেন যা সত্যি প্রশংসা যোগ্য।

বন্দান্তে-

নন্দশ্রী ভিক্ষু

বি.এস.এস (অনার্স) অধ্যয়নরত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম

ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী

১ম সংঘরাজ মহামান্য সারমেধ মহাথেরো

বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম

[সংকলন গ্রন্থ]

বুদ্ধবন্দনা, ইসিপতন, সারনাথতীর্থ, চারপুণ্যতীর্থ, বুদ্ধগয়া (বাংলা), বুদ্ধগয়া (হিন্দি), আগম শাস্ত্র, মহাযান বৌদ্ধধর্ম দর্শন, চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা-

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক-

ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী এম, এ,

বিনয়-সূত্র বিশারদ (সুবর্ণপদক প্রাপ্ত) জৈন-বৌদ্ধ দর্শন শাস্ত্রী
পালি আচার্য, জৈন দর্শন শাস্ত্রাচার্য, মহাযান
বৌদ্ধদর্শন শাস্ত্রাচার্য ও দর্শন বারিধি
কর্তৃক সংকলিত।

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার

বৌদ্ধ মন্দির সড়ক
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

কাশ : আষাঢ়ী পূর্ণিমা, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ মন্দির সড়ক হতে প্রকাশিত।
৪ঠা শ্রাবণ ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, ২১শে জুলাই
১৯৮৬ খৃষ্টাব্দ, ২৫৩০ বুদ্ধাব্দ

াকাশ : প্রয়াত ১০ম সংঘরাজ পণ্ডিত জ্যোতিপাল মহাথেরো'র ১৩ তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত।
২৫৫৮ বুদ্ধাব্দ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ,
১১ এপ্রিল, ২০১৫ খৃষ্টাব্দ।

দনায় : **ভদন্ত সুমনোপ্রিয় থেরো।**

াক : **ভদন্ত শুদ্ধানন্দ থেরো (এম.এ)।**

পরিচিতি : **১ম সংঘরাজ মহামান্য সারমেধ মহাথেরো'র প্রতিকৃতি।**

পরিকল্পনা : **ভদন্ত নন্দশ্রী ভিক্ষু**
সৈয়দবাড়ী ধর্মচক্র বৌদ্ধ বিহার, রাঙ্গুনীয়া।

ান : **৭০ টাকা মাত্র।**

দক : **স্বর্বসত্ব সংরক্ষিত।**

া : **মহামুনি অফসেট প্রসেস এন্ড কম্পিউটার,**
৩৫, কদম মোবারক বাই লেইন জসিম ভবন
(২য় তলা), মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭১৭-২৭৬৭৪৭

উৎসর্গ

যিনি বাংলার মহাযান অধ্যুষিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মকে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে উন্নীত ও রূপান্তরিত করেছেন, সেই পরম পুরুষ মহামান্য সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির, তাঁরই উত্তরসুরী মহামান্য দ্বিতীয় সংঘরাজ আচার্য পুন্নাচার ধর্মধারী চন্দ্র-মোহন মহাস্থবির, মহামান্য তৃতীয় সংঘরাজ জ্ঞানালঙ্কার (লাল মোহন) মহাস্থবির, মহামান্য চতুর্থ সংঘরাজ বরজ্ঞান মহাস্থবির, মহামান্য পঞ্চম সংঘরাজ তেজবন্ত (বঙ্গচন্দ্র) মহাস্থবির, মহামান্য ষষ্ঠ সংঘরাজ ধর্মানন্দ মহাস্থবির, মহামান্য সপ্তম সংঘরাজ অভয়তিষ্য মহাস্থবির, মহামান্য অষ্টম সংঘরাজ শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির এবং তাঁদের অনুসারী যে সমস্ত স্থবির, মহাস্থবির, যাঁরা বুদ্ধের সুব্যাখ্যাত ধর্মবিনয় তথা বিশুদ্ধ স্থবির পরম্পরা পরিচালন ও সংরক্ষণ করে বুদ্ধশাসনকে রক্ষা করেছেন, তাঁদের পুণ্যস্মৃতি স্মরণে আমার "বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম" এই ক্ষুদ্র সংকলন গ্রন্থটি উৎসর্গ করলাম।

বিনীত-

ভিক্ষু শীলাচার

আশীর্বাণী

অধ্যাপক ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী, কর্তৃক সংকলিত "বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম" গ্রন্থটি ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান ও চিন্তাশীল বৌদ্ধ জনগনের চাহিদা পূরণে সমর্থ হবে বলে আমার বিশ্বাস। ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় ঘটনা সমূহকে উপলক্ষ করে সমাজের চিন্তাশীল বিদগ্ধ ও বর্ষীয়ান পন্ডিতবর্গের লেখনি সমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় শুভ উদ্যোগ। এই শুভ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ হলো বর্তমান ও ভাবী প্রজন্মের দুর্লভ সেতুবন্ধন। অতীতের গৌরবদীপ্ত বিজয়গাথায় ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রীর কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থটিতে যাহা উল্লেখিত হয়েছে তা সবই ইতিহাস নির্ভর এবং সত্য। তাই বর্তমানের সাধু সঞ্জীবনী কর্মধারায় গড়ে উঠে ভাবী প্রজন্মের দুর্লভ আশ্রয়স্থল। "বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম" গ্রন্থটির মাধ্যমে একালের সাথে গৌরবদীপ্ত থেরবাদের ইতিহাস সেতুবন্ধন হোক, এই আশাবাদ ব্যক্ত করি।

পরিশেষে উক্ত গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের সম্পাদক আয়ুষ্মান সুমনো প্রিয় থেরো এবং প্রকাশক আয়ুষ্মান শুদ্ধানন্দ থেরো এর নিরোগ ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং গ্রন্থটি বহুল প্রচার হোক, এই কামনা করছি।

আশীর্বাদক

ধর্মসেন মহাস্থবির

সংঘরাজ ডঃ ধর্মসেন মহাস্থবির
অগ্‌গমহাসদ্ধর্মজ্যোতিকাধ্বজ,
ত্রিপিটক সাহিত্য চক্রবর্তী
উনাইনপূরা লঙ্কারাম বিহার।

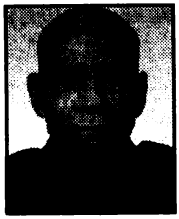

আশীর্বাণী

বর্তমান সমাজ আঙ্গিকে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ও তথ্য নির্ভর গ্রন্থ "বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম" অধ্যাপক ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী, কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থটি অমূল্য রত্ন সদৃশ্য এবং পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত। কিন্তু পূনঃপ্রকাশের অভাবে গ্রন্থখানা সংগ্রহ করা বড়ই দুরূহ হয়ে উঠেছে। এহেন সময়ে অমূল্য রত্ন সদৃশ্য গ্রন্থটি পুনঃমুদ্রন করে পাঠক সমাজে বিতরন করা একান্ত প্রয়োজন। "বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম" গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় শুভ উদ্যোগ। এই শুভ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। আশা করি উক্ত গ্রন্থটি বাংলার মূল থেরবাদ সম্পর্কে ধারণা জাগবে।

পরিশেষে গ্রন্থটি বহুল প্রচার ও পুনঃপ্রকাশের সম্পাদক আয়ুষ্মান সুমনো প্রিয় থেরো এবং প্রকাশক আয়ুষ্মান শুদ্ধানন্দ থেরো এর নিরোগ ও সুদীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

আশীর্বাদক

জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির

শাসন শোভন উপ-সংঘরাজ ডঃ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির

অধ্যক্ষ- নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম।

আশীর্বাণী

এদেশের থেরবাদের সভ্য সংস্কৃতিতে যাদের ত্যাগশীল মহৎ কর্মগুলো এখনো দেদিপ্যমান তারা সময়ের বিবর্তনে প্রকাশনার অভাবে অথবা তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য অবহেলার কারণে তারা আমাদের স্মৃতির মানস পটে উদিত হচ্ছেনা। এই যদি হয় আমাদের কর্তব্যবোধ তাহলে মহাজ্ঞানীরা আমাদের কল্যানের জন্য জন্ম গ্রহন করবেনা। তাই মহামান্য প্রয়াত সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরো মহোদয় এই দেশে রাউলী নামধারী বিবাহিত পুরোহিত ভিক্ষুর অবসান ঘটিয়ে ভারত-বাংলায় প্রকৃত ভিক্ষু সংঘ প্রতিষ্ঠা করে বুদ্ধের শাসন সদ্ধর্মের যে বিজয় পতাকা সূচনা করেছিলেন তার এই ধারাবাহিকতায় অধ্যাপক ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী, কর্তৃক সংকলিত "বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম" গ্রন্থটি খুবই যুগোপযোগী । ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান ও চিন্তাশীল বৌদ্ধ জনগনের চাহিদা পূরণে সমর্থ হবে বলে আমার বিশ্বাস। ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় ঘটনা সমূহকে উপলক্ষ করে সমাজের চিন্তাশীল বিদগ্ধ ও বর্ষীয়ান পন্ডিতবর্গের লেখনি সমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় শুভ উদ্যোগ। এই শুভ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। আশা করি উক্ত গ্রন্থটি বাংলার মূল থেরবাদ সম্পর্কে ধারণা জাগবে।

পরিশেষে উক্ত গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের সম্পাদক আয়ুষ্মান সুমনো প্রিয় থেরো এবং প্রকাশক আয়ুষ্মান শুদ্ধানন্দ থেরো এর নিরোগ ও দীর্ঘায়ু এবং গ্রন্থটি বহুল প্রচার হোক, এই কামনা করছি।

আশীর্বাদক

সত্যপ্রিয় মহাথেরো

বিনয়াচর্য্য পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথেরো
একুশে পদক প্রাপ্ত-২০১৫ ইং
অধ্যক্ষ, রামু সীমা বিহার, রামু, কক্সবাজার।
প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহসভা।

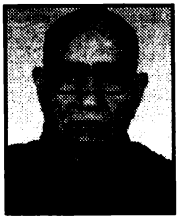

আশীর্বাণী

বাংলায় থেরবাদ সদ্ধর্ম পুনঃপ্রচারে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্যাগী মহামান্য প্রয়াত মহাসংঘরাজ সারমেধ মহাথেরো মহোদয় এই দেশে রাউলী নামধারী পুরোহিত ভিক্ষুর অবসান ঘটিয়ে ভারত-বাংলায় প্রকৃত ভিক্ষু সংঘ প্রতিষ্ঠা করে বুদ্ধের শাসন সদ্ধর্মের যে বিজয় পতাকা সূচনা করেছিলেন বুদ্ধের সেই প্রকৃত আদর্শের অনুসারী ভিক্ষুসংঘ হলো "সংঘরাজ নিকায় "। ভারত বাংলায় সদ্ধর্ম পুনঃজাগরনে সংঘরাজ নিকায়ের অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ। মহামন্য সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরোর আবির্ভাব না হলে অন্ধকার এই বৌদ্ধ সমাজ আলোর সন্ধান লাভ করতো কিনা সন্দেহ। তাই থেরবাদ আদর্শের ঐতিহাসিক সত্য ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ অধ্যাপক ভিক্ষু শীলচার শাস্ত্রীর কর্তৃক সংকলিত "বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম" গ্রন্থটি বর্তমান সময়ে খুবই যুগোপযোগী । বাংলায় থেরবাদের ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান ও চিন্তাশীল বৌদ্ধ জনগনের চাহিদা পূরণে সমর্থ হবে বলে আমার বিশ্বাস। ঐতিহাসিক এ গ্রন্থ প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় শুভ উদ্যোগ। আশা করি উক্ত গ্রন্থটি বাংলার মূল থেরবাদ সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের ভিক্ষুসংঘ এবং দায়ক/দায়িকাদের ধারণা জাগবে।

গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের সম্পাদক আয়ুষ্মান সুমনো প্রিয় থেরো এবং প্রকাশক আয়ুষ্মান শুদ্ধানন্দ থেরো তারা দুই জনে নতুন প্রজন্মের ভিক্ষুসংঘ এবং দায়ক/দায়িকাদের কাছে সত্য ইতিহাস সমূহ তুলে ধরার আলোকে গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশ করতে যাচ্ছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। আমি আনন্দ চিত্তে তাদের এ মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

পরিশেষে এই গ্রন্থখানি পুনঃ প্রকাশে, আর্থিক, কায়িক, বাচনিক সহযোগিতা দানকারীদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে এবং এ পুণ্যের প্রভাবে তাদের নির্বাণ লাভের হেতু হোক, এই আশীর্বাদ সহ এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করছি।

আশীর্বাদক

ধর্মপ্রিয় মহাথের

শাসন স্তম্ভ বিচিত্র ধর্মকথিক ধর্মপ্রিয় মহাথেরো
অধ্যক্ষ- মহানন্দ সংঘরাজ বিহার,
মহামুনি পাহাড়তলী, রাউজান, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা বাণী

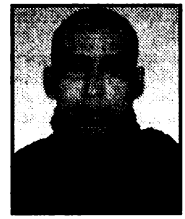

"বিনয় বুদ্ধ শাসনের পরম আয়ু" বিনয়ানুশীলন ভিক্ষু জীবনকে পরিশুদ্ধ করে। আর পরিশুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ বৌদ্ধ শাসনের আলোকিত ভিত্তি। বিনয় কিংবা বিনয়াশ্রিত সংঘের সমন্বয়ে গড়ে উঠে শাসন সদ্ধর্মের প্রকৃত ইতিহাস। আমাদের সেই থেরবাদ ইতিহাসের অন্যতম গ্রন্থ হল অধ্যাপক ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী, কর্তৃক সংকলিত "বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম" গ্রন্থটি খুবই যুগোপযোগী এবং পুনঃ প্রকাশ সময়ের দাবী। তারই আলোকে বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল কর্তৃক পরিচালিত বিশ্বশান্তি প্যাগোডার প্রাক্তন অধ্যক্ষ, প্রয়াত ১০ম সংঘরাজ পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় জ্যোতিপাল মহাথেরো'র ১৩ তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে পুনঃ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমরা সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল আনন্দানুভাব করছি। এটা আমাদের সবার জন্য গৌরবনন্দিত সমাচার। "বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম" গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় শুভ উদ্যোগ। এই শুভ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি উক্ত গ্রন্থটি বাংলার মূল থেরবাদ সম্পর্কে ধারণা জাগবে।

পরিশেষে উক্ত গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের সম্পাদক আয়ুষ্মান সুমনো প্রিয় থেরো এবং প্রকাশক আয়ুষ্মান শুদ্ধানন্দ থেরো এর নিরোগ ও দীর্ঘায়ু এবং গ্রন্থটি বহুল প্রচার হোক, এই কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে-

বুদ্ধরক্ষিত মহাথেরো
সভাপতি

মৈত্রীপ্রিয় মহাথেরো
সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল।

পুন প্রকাশের সম্পাদক ও প্রকাশকের কিছু কথা

থেরবাদ আদর্শে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম পুনঃ জাগরনের ঐতিহাসিক সত্য ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রন্থ বর্তমান সময়ে প্রায় বিলুপ্ত। সময়ের বিবর্তনে অতীতের সত্য ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রন্থগুলো পুনঃপ্রকাশ করে নতুন প্রজন্মের ভিক্ষুসংঘ এবং দায়ক/দায়িকাদের হস্তগত করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কারন ঐতিহাসিক সত্য ইতিহাস সমূহ নতুন প্রজন্মের ভিক্ষুসংঘ এবং দায়ক/দায়িকাদের কাছে হস্তগত করা না হলে তারা অতীত সত্য ইতিহাস সমূহ জানতে পারবে না। তাই থেরবাদ আদর্শের ঐতিহাসিক সত্য ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ অধ্যাপক ভিক্ষু শীলচার শাস্ত্রীর কর্তৃক সংকলিত **"বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম"** গ্রন্থটি আমরা দুই জনে নতুন প্রজন্মের ভিক্ষুসংঘ এবং দায়ক/দায়িকাদের কাছে সত্য সমূহ তুলে ধরার আলোকে গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশের দুর্লভ সুযোগ লাভে আমরা নিজেদেরকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি। কারন বর্তমানে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে নিকায়ের দ্বন্দয়ে জর্জড়িত হয়ে থেরবাদের মূল আদর্শে থেকে আমরা দুরে সরে যাচ্ছি। সুতরাং এই ধরনের গ্রন্থ যদি ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য প্রকাশ না করি তাহলে হয়তো তাদের কাছে আমরা দায়বদ্ধ থাকব সে কারণে **"বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম"** গ্রন্থটি দ্বিতীয়বার প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন অনুধাবন করে আরো কিছু কিছু এ বিষয়ে যারা মতামত ও লেখনী ধারণ করেছেন তাদেরই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাবলী গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২য়-তে সংযোজন করেছি বিধায় তাদেরকেও কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই।

অতঃএব বাংলাদেশী থেরবাদী বৌদ্ধদের ঘরে ঘরে এই অমূল্য গ্রন্থটি সমাদৃত হোক এবং অনাদিকাল পর্যন্ত স্বাক্ষী হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হোক। বৌদ্ধধর্ম দর্শন মানুষের জীবনে শত-শতাব্দী বহমান থাকুক শান্তি ও কল্যাণের বারতা নিয়ে। এ অমূল্য রত্ন **"বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম"** গ্রন্থটি অনুসন্ধিৎসু বৌদ্ধদের সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের পাশাপাশি মননের ক্ষেত্রে তার যোগ্য স্থান করে নিতে সক্ষম হোক এই আমাদের নিবেদন।

পরিশেষে, এ অমূল্য গ্রন্থখানি পুনঃ প্রকাশে, যাঁরা আশীষ বাণী দিয়ে গ্রন্থের গুণগত মান বৃদ্ধি করেছেন এবং অন্যান্য ভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে শ্রীমৎ শান্তিজ্যোতি থেরো, শিক্ষক প্রজ্ঞানন্দ থেরো, শ্রীমৎ নন্দশ্রী ভিক্ষু, বাবু দীপঙ্কর বড়ুয়া, বাবু সুদত্ত মুৎমুদ্দী, বাবু সজল বড়ুয়া, বাবু সঞ্জয় বড়ুয়া (সতু), বাবু বাবলু বড়ুয়া'র কাছে চিরকৃতজ্ঞ এবং সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গলময় জীবন কামনা করছি।

গুণমুগ্ধ-

সম্পাদক প্রকাশক

লেখকের বক্তব্য

আমাদের অতীত ইতিহাস অতি উজ্জ্বল ও গৌরবদীপ্ত। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে, উত্থান-পতন নীতিতে আজ আমরা আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হয়েছি। সেই কথা আমরা একটি বারও কেহ চিন্তা করি কি? অনেকে আক্ষেপ করেন-"বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজে বহু সুবিদ্বান, সুলেখক আছেন, তথাপি এতদিন একখানি জাতীয় ইতিহাস লিখিত ও প্রকাশিত হয় নাই।" এটা একটা জাতির পক্ষে বড়ই আক্ষেপ জনক। জাতির মঙ্গলকামী সুশিক্ষিত হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য একখানি জাতীয় ইতিহাস তৈরী করা। যেই জাতির ইতিহাস নাই, সেই জাতি জীবন্মৃতের ন্যায়। নাই বলে হতাশ হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে কেন? তুমি যা জান লিখ, আমি যা জানি লিখব, অপরে যা জানে লিখবে। এভাবে জাতীয় ইতিহাস গড়ে উঠবে। এই অভিপ্রায় নিয়েই আমি অতীত ইতিহাসের ছেড়া পাতা হতে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করে এক সূত্রে গাঁথার চেষ্টা করেছি। "চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম" গ্রন্থটিও সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই লিখেছিলাম।

আমি ঐতিহাসিক নহি, ইতিহাসের ছাত্রও ছিলাম না, তবে ইতিহাস জানার প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং এখনও আছে ; তাই এই ছোট প্রচেষ্টা। কিন্তু ইতিহাসের ধারা-প্রবাহ সরল নয়, বঙ্কীম দ্বন্দ্ব সংকুল ; সুতরাং ইতিহাসের গতি প্রকৃতি বড়ই বিচিত্র। বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক নজরে বাংলাদেশের ইতিহাস দেখলে বলতে হয়, বাংলাদেশের প্রচলিত ধর্ম প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম ছিল না। তা ছিল তন্ত্রযান, মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান মিশ্রিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। পরে কিছুদিন আরাকানী বৌদ্ধদের সংমিশ্রণে এসে কিছুটা রং বদলেছিল। তা ছিল বিকালে অন্ন বর্জন, আর স্থবির পরম্পরানুসারে চীবর ধারণ করা, আর সব বরাবরই ছিল। মুসলিম আগমনের সময়ও ছিল এই তান্ত্রিকতায় ভরপুর। পুরীর জগন্নাথ মন্দির গাত্রে, কোণারকের মন্দির গাত্রে এবং পাহাড়পুরের টেরাকোটায় এই তান্ত্রিক জীবন পন্থার উলঙ্গ যৌন ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও যদি কেহ বলে 'তারাই মৌদ্গালী পুত্র তিষ্য স্থবিরের পরম্পরা।' ধর্মকীর্তির ভাষায় বলতে গেলে- 'ধীক্ ব্যাপকতম।'

ব্রিটিশ আমলে এসে আমরা কিছুটা সংস্কৃত হই, আরাকানীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে। তারপর মহামান্য সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আরাকান, কক্সবাজার ও রামু হতে ২৫-৩০ জন মারমা-রাখাইন ভিক্ষুসহ (চট্টগ্রাম) মহামুনী পাহাড়তলী এসে হাঞ্চার ঘোনার এক পাহাড়ী ছড়ায় জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির প্রমুখ সাতজন তথাকথিত স্থবির, মহাস্থবিরকে তাঁদের পূর্ব শিক্ষাপদ ত্যাগ করিয়ে বিনয় বিধান মতে পুনঃ উপসম্পদা প্রদান করে পরিশুদ্ধ স্থবির পরম্পরা ভিক্ষুসংঘের প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহামান্য সংঘরাজ

সারমেধ মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা কার্য সম্পন্ন হওয়ায় তাঁদের নামকরণ করা হয়েছিল "সংঘরাজ নিকায়" সুতরাং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলো "বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম।"

এই ছোট বইটিতে উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত, বহু রোমাঞ্চকর ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে। অধিকন্তু বাংলার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম হতে পরিশুদ্ধ স্থবিরবাদ বৌদ্ধধর্মে সংক্রমন এবং পরবর্তী অবস্থা সবিশেষ আলোচিত হয়েছে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করতেছি যে, বইটি লিখতে মদীয় আচার্যদেব অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ভারতীয় ভিক্ষু মহাসভার মহামান্য সংঘরাজ শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের গ্রন্থ হতে বহু উপাদান গ্রহণ করেছি। অধিকন্তু তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সেও এই গ্রন্থের জন্য একটি সুচিন্তিত, তথ্যবহুল, সারগর্ভ, মূল্যবান ভূমিকা লিখে দেওয়ায় বইটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জন্য আমি তাঁর কাছে চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলাম। এ ছাড়াও যাঁদের বই থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি তাঁদের কাছেও আমি চির-ঋণী রইলাম।

ভূমিকা

অধ্যাপক ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী সংকলিত 'বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম' মুদ্রিত আকারে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ইহা বৌদ্ধধর্মের সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছরে বৌদ্ধধর্ম কত শাখা প্রশাখায় বিভক্ত ও প্রসারিত হইয়াছে এবং ইহার কত উত্থান্ পতন ঘটিয়াছে সেই সম্বন্ধে গ্রন্থকারের প্রচুর অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। শুধু বৌদ্ধধর্ম নহে, অপর ধর্ম শাস্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাহার রচিত গ্রন্থাবলী ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ভগবান বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্য মহাকাশ্যপ, উপালী, দাশক শোণক প্রভৃতি থের পরম্পরায় আহরিত হওয়ায় পালি ভাষায় সংগৃহীত বুদ্ধ বাণীকে থেরবাদ বা প্রাচীন মতবাদ বলা হয়। ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের মতে উহা 'আদি বৌদ্ধ ধর্ম'। বুদ্ধের জীবদ্দশায় ইহা ভারতের মধ্য দেশে প্রচারিত হয়। পরবর্তীকালে মৌদ্‌গলীপুত্র তিষ্য ও সম্রাট অশোকের সহায়তায় ইহা বিদেশেও প্রসারিত হয়। শ্রীলংকা, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে থেরবাদ ধর্ম এখনো সগৌরবে বিরাজমান। প্রায় সহস্র বৎসর পর ভারতে ইহা ক্ষীণপ্রভ হয়। মগধের আচার্য বুদ্ধঘোষ থেরবাদ ধর্মের গবেষণার জন্য শ্রীলংকায় গমন করিতে বাধ্য হন। বর্তমান গ্রন্থকারের মতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর ভারতে ইহা নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

পক্ষান্তরে সম্রাট কণিষ্কের সময়ে বৌদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হইতে থাকে। সংস্কৃত ভাষায় অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়। পরবর্তী সময় তাঁহারা সৌত্রান্ত্রিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক, এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন সংগ্রহে' এই চারি মত সংগৃহীত হইয়াছে। অতঃপর যোগাচার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায় একত্রিত হইয়া নিজেদের নাম করেন মহাযান ও অপর দুই সম্প্রদায়কে হীনযান আখ্যা দেন। এই যান বিভাগের কারণ হিসাবে বলা হয়-মহাযানিরা সকলে সম্যক সম্বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব। সকলকে মুক্ত করিয়া নিজেরা মুক্ত হইবেন, আর হীনযানিরা শ্রাবক রূপে একাকী মুক্ত হইবেন। বোধিসত্ত্ব যান মহান হেতু তাঁহারা মহাযান। থেরবাদে বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ ও শ্রাবকরূপে মুক্তির স্বীকৃতি রহিয়াছে।

কালক্রমে মহাযান ও হীনযান মিশ্রিত হইয়া একাকার ধারণ করে। ক্রমশঃ তন্ত্রযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান কালচক্রযান ও সহজযান প্রভৃতিতে পর্যবসিত হইয়া আদি বৌদ্ধধর্ম হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়ে। তখনকার নালন্দা, বিক্রমশীলা, সোমপুর, কণকস্তুপ, পণ্ডিত বিহার প্রভতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই তান্ত্রিক ধর্মের অধ্যাপনা চলিত। রাজা মহারাজাদের সহায়তায় এই মত থেরবাদ অধ্যুষিত অঙ্গনেও প্রবেশ করে। উত্তর ব্রহ্মের অরিমর্দন নগরে একাদশ শতাব্দীতে তান্ত্রিক মতের প্রচলন দেখা যায়। ভদন্ত অরহন্ত থের ও

রাজা অনুরুদ্ধের প্রচেষ্টায় সুধর্মপুর হইতে আনিয়া থেরবাদ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তান্ত্রিক মত শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়াও প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু স্থায়ী হতে পারে নাই।

বঙ্গদেশে পাল, সেন, চন্দ্র, দেব ও খড়গ বংশের রাজত্বের সময় এই তান্ত্রিক ধর্ম প্রচলিত ছিল। তদানীন্তন বিহারগুলিতে তান্ত্রিক ধর্মের চর্চা হইত। আচার্যদের রচিত গ্রন্থাবলী সেই ধর্মের অন্তর্গত ছিল। আরাকানের শাসনকালেও বাঙ্গালী বৌদ্ধেরা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর অপরার্ধে (১৬৬৬ খৃঃ) চট্টগ্রামে উহা শেষ হয়। এই সময় পণ্ডিত বিহার, চক্রশালা, দেবগ্রাম, রামকোট বিহারগুলি ক্রমশঃ ধ্বংস হয়। তখন রাখাইন ও মারমা বৌদ্ধেরা স্বল্পভার মহামূল্য রত্নরাজি লইয়া আরাকানে চলিয়া যান। বাংলা ভাষাভাষী বৌদ্ধেরা স্বদেশে রহিয়া গেলেন। কিন্তু নবাবের রাজস্ব আদায়ের ভয়ে বনে জঙ্গলে বাস করিতে লাগিলেন। রাজকীয় আনুকূল্যের অভাবে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। এই সময় অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া স্বস্তি লাভ করেন।

পক্ষান্তরে চৈতন্যদেবের শিষ্যদের মধ্যে নিত্যানন্দ বীরভদ্র ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিদের প্রচারে অনেক বৌদ্ধ গৌড়িয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূক্ত হইলেন। তান্ত্রিক ধর্মে হিন্দু ও বৌদ্ধকে একাকার করিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামে বৌদ্ধ রাজত্বের অবসান ঘটে। সেই সময় বৌদ্ধ বিহারগুলি ধ্বংস হয়, বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ নষ্ট হয়। ধর্ম গুরুরা ইতস্তত পলায়িত কিংবা নিহত হন। এই সময় কোন কোন বৌদ্ধের বাড়ীতে হস্তলিখিত 'গোর্খ বিজয়' 'মানিক চন্দ্র', ময়নামতীর গান প্রভৃতি পঠিত হইত। এই সকল গ্রন্থে তান্ত্রিক আচার্যদের অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ দেখা যায়। পণ্ডিত আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এক বৌদ্ধের বাড়ী হইতে 'গৌর্খ বিজয়' সংগ্রহ করিয়া সম্পাদনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে উহা প্রকাশিত হয়। ইহাতে রাউলী নামে এক শ্রেণীর বিবাহিত বৌদ্ধ পুরোহিতের সন্ধান পাওয়া যায়। '....মহাস্থবিরদের অবদান' গ্রন্থের ভূমিকা লেখক রাউলী শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতে আরব দেশের আওলীয়া শব্দের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। আওলীয়ারা অবিবাহিত নহেন। কারণ ইসলাম ধর্ম ব্রহ্মচর্য মানে না। ভারতীয় ভাষায় পূজারীকে রাউলী বলা হয়। বাংলা ভাষার প্রাথমিক অনেক গ্রন্থে রাউলীদের উল্লেখ আছে। ইহার অর্থের জন্য আরবে যাবার প্রয়োজন কি? মনে রাখিতে হইবে যে, রাউলীরা আওলীয়া হইলেও থেরবাদী উপসম্পন্ন ভিক্ষু হইবেন না।

সেই সময়ে বাংলার বৌদ্ধদের মধ্যে 'মঘাখন্‌মৌজা' নামে হাতে লেখা এক ধর্ম গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। (পৃঃ ৭) ইহা মগধ বৌদ্ধদের ধর্ম বই। খন্‌পা

(পুরুষ লামা) ও জমৌ (নারী লামা) উভয়ের আচরিত ধর্মমত ইহাতে সংগৃহীত রহিয়াছে। নেপাল, ভূটান ও সিকিমের ভোগী লামাদের ন্যায় রাউলী ও রাউলীনীরা এই গ্রন্থ অনুসারে পূজার্চনা করিতেন সম্ভবত ইহা অপভ্রংশ ভাষায় সংকলিত ছিল। পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া পদ্যানুবাদ করিয়া 'ধর্ম পুরাবৃত্ত' নাম দিয়াছেন। এই বিস্ময়কর নামের মধ্যে ইহার ইতিবৃত্ত নিহিত আছে। পূর্বকালে প্রচলিত 'ধর্মই ধর্ম পুরাবৃত।' পণ্ডিত মহাশয় সিংহল ও শ্যামদেশে পালি সাহিত্যের চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী থেরবাদ অনুসারী ধর্মগ্রন্থ। তৎ পূর্বেকার তান্ত্রিক বৌদ্ধদের পূজা পার্বন ও ধর্ম চর্চার বিধি এই গ্রন্থে বিধৃত ছিল।

'বৌদ্ধ বিবাহ মন্ত্র' নামে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়তলীর সরু পণ্ডিতের উদ্যোগে উহা মুদ্রিত হয়। ইহাও অপভ্রংশ ভাষায় সংকলিত। মন্ত্রের প্রথমে আছে "উং তালি মহাতালি পূর্ব তালি পশ্চিম তালি.....তালি ত্রিংশ বব্রেস্বহা।" শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালোক মহাথের উহাকে পালি ভাষায় রূপান্তরিত করেন। তিনি ইহার মর্ম উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই। শুধু ত্রিংশ সংখ্যাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। দশ পারমী, দশ উপপারমী, দশ পরমার্থ পারমীর সমন্বয়ে ত্রিংশ পারমীতার প্রভাবে জয় মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। আসলে উহা তালি নহে তান্ত্রিক দেবতা তারা। দশ দিকের তারা ভূত-ভবিষ্যত ও বর্তমান সংযোগে ত্রিশ সংখ্যা হইয়াছে। সম্ভবতঃ পুরোহিত মন্ত্র পাঠের সময় করতালে তাল মিলাইতেন। তজ্জন্য ইহার নাম হয় তাইলা মন্ত্র।

সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধে মনিষী ডঃ বেনী মাধব বড়ুয়া বিবাহ মন্ত্র সংশোধনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রজ্ঞালোক সংশোধিত সংস্করণ সমর্থন ও গ্রহণ করেন। বিবাহ মন্ত্রে 'উংনম্মতে সিদ্ধি কার্যং' প্রভৃতি ভনিতা দেখিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বাঙ্গালী বৌদ্ধেরা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। দেব-দেবীর পূজায় পশু পক্ষী বলি দেওয়াই মনে হয় শাক্তদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ট ছিল।

চাকমা বৌদ্ধ সমাজে পাওয়া গিয়াছে সাধু শিব চরণের 'গোজেন লামা'। এই নামের তাৎপর্য আছে। গোজেন মানে গোসাই, গোস্বামী বা প্রধান। আর লামা মানে বিবাহিত ধর্ম গুরু। এই লামাদের সহিত পূর্ব বঙ্গের রাউলীদের সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

পূর্বোক্ত গ্রন্থ সমূহের সাহায্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের পূজা পার্বন নিয়ন্ত্রিত হইত। রাউলীরা তাহাতে পৌরহিত্য করিতেন। অবস্থাপন্ন বৌদ্ধদের বাড়ীতে ঠাকুর ঘর ছিল। তাহাতে সময় অনুসারে দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, গণেশ, কার্তিক, শিব, সরস্বতী, অম্বুবাচী, মনসা, শনি ও মগধেশ্বরীয় পূজা সমারোহে সম্পন্ন হইত। বারুনী স্নান, ইছামতী পূজা, চরক, ক্ষেত্রপাল পূজা ও বিষুব সংক্রান্তি উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী প্রাতঃ সন্ধ্যায় সদর দরজায় যাগ দেওয়া হইত। ডঃ

প্রণব কুমার বড়ুয়ার মনে করেন উহারা মহাযানী পূজা। থেরবাদীরা ধন দৌলত প্রার্থনা করিয়া যাগ-যজ্ঞ করেন না।

রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে চট্টগ্রাম বিভাগের বৌদ্ধগণ ক্রমশঃ গৌড় মগধের যোগ সূত্র হারাইলেন। নিজেদের তীর্থ মেলার বিষয় ও ভূলিয়া গেলেন। এই সময় চট্টগ্রাম বৃটিশ শাসনে আসে। তাঁহাদের ধর্মীয় উদারতার দরুণ স্থানীয় বৌদ্ধেরা আবার সংগঠিত হইতে থাকেন। তাঁহারা নিজেদের তীর্থ মেলা গড়িয়া লইলেন। চন্দ্রনাথ পর্বত শিখর প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থ। তদানীন্তন বৌদ্ধদের ধারণা ছিল, উহা বুদ্ধের পরিনির্বাণ স্থান কোশীনগর। দ্বিজ দ্রোণ তথায় বুদ্ধের পুতাস্থি বিভাগ করিয়াছেন। এখানে বৌদ্ধরা উপস্থিত হইয়া মৃত আত্মীয় স্বজনের ভস্ম দান করিতেন এবং টিকোজি খানা বট গাছের শাখায় ঝুলাইয়া দিতেন। চন্দ্রনাথের পাদদেশে স্বয়ম্ভুনাথ। কাটমাণ্ডুর স্বয়ম্ভুনাথের ন্যায় উহাও বৌদ্ধ তীর্থ। উহার দক্ষিণ পার্শ্বে জ্বলন ধারা বা উষ্ণ প্রস্রবন। উহাতে তীর্থ যাত্রীরা স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতেন। পটিয়া থানার চক্রশালা, পাহাড়তলীর মহামুনি ও রাঙ্গুনীয়ার শাক্যমুনি মন্দির প্রাঙ্গনে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী মেলা বসে। মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে ঠেগর পুণিতে ও অন্যত্র তিন দিন ধরিয়া মেলা হয়। চন্দ্রনাথ পাহাড় হইতে পূর্ব বাহিনী মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইয়া হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি থানার সীমারেখা রূপে হালদা নদীতে পড়িয়াছে। বারুণী স্নান উপলক্ষে উহার তীরে মেলা জমে। হিন্দু বৌদ্ধেরা তথায় যোগদান করেন। গত এক বছরের মধ্যে যাহাদের কোন আত্মীয় পরলোক গমন করিয়াছেন ; তাহাদের উদ্দেশে বৌদ্ধেরা দধি-চিড়া দান করেন। রাউলী পুরোহিতেরা দান গ্রহণ করেন। তৎসম্বন্ধে প্রবাদ আছে।

"মন্দাকিনীর স্রোত জলে চিড়া ভিজায় ছিবা তলে।"

এই সকল তীর্থ মেলায় রাউলী পুরোহিতেরা পূর্ব ভাগে উপস্থিত হইয়া আসন পাতিয়া বসেন। গৃহীরা তাঁহাদিগকে খাদ্য, ভোজ্য, চাল, কড়ি, টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করিয়া দান দেন। এই প্রথা নেপালের তান্ত্রিক বৌদ্ধদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত নেপালী বৌদ্ধদের সংঘ মহাদানের সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। থেরবাদী বৌদ্ধদের দান প্রণালী অন্য রকম। ভিক্ষুরা ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া খাদ্য ভিক্ষা করেন। নিক্ষিপ্ত চাল, পয়সা, কড়ি গ্রহণ করেন না। সম্প্রতি লংকা, বর্মায় শিক্ষিত ভিক্ষুরা এই ভাবে দান গ্রহণে সঙ্কোচ বোধ করেন। পরলোকগত আত্মীয়দের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কিংবা ঐ সকল তীর্থ মেলায় বৌদ্ধেরা ৭, ১৪, ২৮ হাত দীর্ঘ পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁহাদের ধারণা এই পতাকা বাতাসে যতবার উড়িবে, দাতারা তত কল্প স্বর্গে বাস করিবেন। ধর্ম পুরাবৃত্তে ইহার স্বীকৃতি মিলে। এইরূপ পতাকা এখনও মহাযানীদের ঘরে ঘরে সাগ্রহে উত্তোলিত হয়।

এই সকল পুজা পার্বনে ও তীর্থ-মেলায় রাউলীরা পৌরহিত্য করিতেন।

ব্রহ্মরাজ আরাকান আক্রমণ করিলে নির্যাতিত বহু আরাকানবাসী ভিক্ষু ও গৃহী চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বরিশাল জেলায় আসিয়া বসবাস করেন। এই সময় বাঙ্গালী বৌদ্ধেরা থেরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তান্ত্রিক রাউলীরা বিবাহ বন্ধ করিলেন। থেরবাদী ভিক্ষুদের অনুকরন করিতে লাগিলেন। এই ধর্ম সংস্কারে শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ সারমেধ মহাথের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে বাঙ্গালী বৌদ্ধেরা মহাযান মত ত্যাগ করিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা মুক্ত হইয়া স্বতন্ত্র বৌদ্ধ সমাজে পর্যবসিত হইলেন।

দুইজন লেখকের যৌথ প্রচেষ্টায় "বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মে মহাস্থবিরের অবদান" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির। বইটা তখনও আমাদের হাতে পড়ে নাই। একজন ধর্মপ্রাণ উপাসক জানান যে, ইহাতে ধর্মাধারকে আক্রমণ করা হইয়াছে। আর এক সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার জানান যে, একটা ধর্মাধার প্রশস্তি প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি বইটা একজন বেতন ভোগী এডভোকেট দ্বারা ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়া সর্বত্র বিতারিত হইবে। মহাথেরদের অবদান লিখতে গিয়া কাহারও মুণ্ডপাত ও প্রশস্তি গান করিলে যদি থেরবাদ উপসম্পদা লাভ হয় তবে মন্দ কি? ঐতিহাসিকেরাই ইহার বিচার করিবেন।

বাংলাদেশের দলভেদ লেখকের পিতার জন্মের পূর্ব হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ভিক্ষু মহাসভা গঠনের দরুণ তাহা হয় নাই। এই দেশের সহজিয়া রাউলীদের বিকাল ভোজন ও বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। উচ্চতর দীক্ষার বয়স অনির্দিষ্ট ছিল তাঁহারা ভোগী লামাদের ন্যায় যে কোন বয়সে রাউলী হইতেন। আচার্য পূর্ণাচার ও জ্ঞানালংকার যথাক্রমে সতের ও চৌদ্দ বছর বয়সে রাউলী দীক্ষা গ্রহণ করেন। কলিকাতায় পাল সাহেবের নিকট 'ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ' অধ্যয়নের সময় শ্রদ্ধেয় পুর্ণাচার জানিতে পারেন যে, তিনি থেরবাদ বিনয় সম্মত উপসম্পন্ন ভিক্ষু নহেন। সেই কারণে প্রকৃত উপসম্পদা লাভের নিমিত্ত তিনি আকিয়াব ও মাণ্ডালয় গিয়া উপসম্পদা গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে সংঘরাজ সারমেধের উপাধ্যায়ত্বে ১৮৬৪ খৃঃ চট্টগ্রামে থেরবাদ উপসম্পদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আচার্য পূর্ণাচার ব্রহ্মদেশে ও শ্রীলংকায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৬৬ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সংঘরাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু সংঘে যোগদান করেন। বাঙ্গালী ভিক্ষুদের ধর্ম শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার উদ্যোগে রাজানগরে ঐতিহাসিক ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে চট্টগ্রামের উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনেক রাউলীকে তিনি থেরবাদ উপসম্পদা প্রদান করেন। কিন্তু প্রদীপের নীচে অন্ধকার থাকিয়া যায়। তাঁহার পরমাত্মীয় সুধন মাথে প্রমুখ দক্ষিণাঞ্চলের মাথেগণ থেরবাদ উপসম্পদা গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তজ্জন্য তিনি মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ। এই কারণে ১৮৭১ সালে তিনি চিরতরে জন্মভূমি ত্যাগ

করিলেনঃ-

"কাক কেন ময়ূর সেজে জগতকে ভুলাতে যাও,
বাহির ভিতর দুই সমান রাখ ভাই মানুষ যদি হতে চাও।"

আচার্য পূর্ণাচার বর্মা ও শ্রীলংকায় বার বছর কাটাইলেন। ইতিমধ্যে সংঘরাজ সারমেধ মহাপ্রয়াণ করিলেন। এতদিনে শ্রদ্ধেয় সুধন মাথের মনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেশে আসার জন্য সাদর আহবান জানাইলেন। তাঁহার আহবানে আচার্য পূর্ণাচার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১৮৮৪ সালে দক্ষিণ অঞ্চলের রাউলীগণ থেরবাদ উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া প্রকৃত ভিক্ষু হইলেন। বিশ বৎসর পরে তাঁহারা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিলেন। কয়েকজন মহাস্থবিরের তখন বোধোদয় হইল না। এই থেরবাদী ভিক্ষুরাই আরাকান ও ব্রহ্মদেশের সুধম্ম নিকায়ের অন্তর্গত হইলেন। তৎপূর্বেকার তান্ত্রিক রাউলীরা দ্বারা সুধম্ম ও সুইজাং এর কোন নিকায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। যাঁহারা উপসম্পদা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা সেই রাউলী পরম্পরায় রহিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে থেরবাদের অনুকরনে বিবাহ আদি ত্যাগ করিয়াছেন মাত্র। সৌভাগ্যের বিষয় যে, মহাস্থবির নিকায়ের প্রতিনিধি শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির ও শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাস্থবির শতাধিক বর্ষ পরে ১৯৬৬ সালে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিয়া তদানীন্তন সংঘরাজ অভয় তিষ্য মহাস্থবিরের সঙ্গে এক সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, যাহা এই বই এর উপসংহার অংশে মুদ্রিত রহিয়াছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেশ হইতে পাঁচজন ভিক্ষু আহবান করিয়া কর্মবাক্য পাঠের মাধ্যমে দল মিলন ঘটিবে। তজ্জন্য উভয় নিকায়ের কার্যকরী সমিতির অধিবেশন একই দিনে ভিন্ন স্থানে আহুত হয়। কিন্তু শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের স্বনিকায়ের সম্মতি অর্জন করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি তিনি স্বনিকায়ের মহা সংঘনায়ক। তিনি কেন এই পদ গ্রহণ করিলেন তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া সৈয়দবাড়ী ধর্মচক্র প্রবর্তন বিহারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, দল মিলানের জন্যই তিনি মহানায়ক হইয়াছেন। সাধুবাদ! আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিব-তাঁহাদের স্বাক্ষরিত প্রস্তাব বাস্তবায়িত করিয়া দেশের বিভেদ চিরতরে শান্ত করুন।

বাংলাদেশের থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মের যথার্থ ইতিবৃত্ত সংকলন করিয়া গ্রন্থকার শ্রীমৎ শীলাচার মহাথের ধন্য বাদার্হ হইলেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

৩০। ৫। ৮৬ ইং
১, বুড্ডিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রী ধর্মাধার মহাস্থবির
অধ্যক্ষ,
নালন্দা বিদ্যাভবন।

বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম

বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের পর খৃঃ পুঃ ৫৪৪ অব্দে মহাকাশ্যপ স্থবিরের অধ্যক্ষতায় প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতির অধিবেশনে ত্রিপিটক বুদ্ধবচন সমূহ সংগৃহীত হয়। পরবর্তী অশোকের সময় পর্যন্ত বৌদ্ধসংঘ অষ্টাদশ নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সকল নিকায় ভেদ নিরাকরণ করত বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য মহারাজ অশোক খৃঃ পুঃ ২৫৩ অব্দে মৌদ্‌গলীপুত্র তিষ্য স্থবিরের নেতৃত্বে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি আহবান করে বুদ্ধবচনের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করেন এবং তা পরবর্তী খৃষ্টপূর্বাব্দে (২৫) শ্রীলংকায় বট্টগামণী অভয়ের রাজত্বকালে পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়, যা থেরবাদ পরম্পরা এখনও চলে আসছে।

মহারাজ অশোকের পর বৌদ্ধধর্মে পুনঃ নানা মতবাদ দেখা দেয়, যার ফলস্বরূপ মহাযান সূত্রগুলি রচিত হয় এবং ক্রমে দার্শনিক মতবাদগুলি বিকাশ লাভ করে। তথাপি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম ভারতে কোন না কোন প্রকারে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রেখে ছিল, হিউয়েনসাংয়ের ভ্রমণ কাহিনীতেও তার প্রমাণ মিলে। তারপরে ভারতে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের কোন নিদর্শন এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশেষ করে বাংলাদেশে পাল রাজবংশের অভ্যুদয়ে মহাযান মত-তন্ত্রযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বিকাশ লাভ করে। কিন্তু স্বীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং মূল বৌদ্ধধর্ম হতে বহু দূরে সরিয়ে পড়ে। পূর্ব-বাংলার খড়গবংশ, দেববংশ, চন্দ্রবংশ প্রভৃতি কয়েকটি বৌদ্ধ রাজবংশ রাজত্ব করতেন। তাঁদের আমলেই চট্টলের পণ্ডিত বিহার উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে। প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য তুল্যপাদ বা প্রজ্ঞাভদ্র চট্টগ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন পণ্ডিত বিহারের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম-বজ্রযান ও সহজযানের বহু গ্রন্থ এবং একখানি দোহাকোষ রচনা করেছিলেন। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মই খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চট্টগ্রাম সহ সমগ্র বাংলাদেশে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় প্রসিদ্ধ তন্ত্রসাধিকা অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী মদনাবতী বা ময়নামতির আবির্ভাব ঘটে। তাঁর বহু অলৌকিক ঘটনার কাহিনী বাংলার ঘরে ঘরে গীত হতো। পরবর্তীকালে এই ময়নামতিই "মগধেশ্বরী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরায় মহারাজ ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫১৭) চট্টগ্রাম আক্রমণ করে মগধেশ্বরীকে নিয়ে উদয়পুরে "ত্রিপুরাসুন্দরী" নামে প্রতিষ্ঠা করেন। তথাপি চট্টগ্রামে মগধেশ্বরী "সেবাখোলা" সংখ্যায় এত অধিক ছিল যে, হিন্দু-বৌদ্ধ দেবালয় হতে এই সংখ্যা অনেক বেশী। পূর্বে চট্টগ্রামের হিন্দু-বৌদ্ধ সকলেই এই দেবীর উদ্দেশ্যে সেবা দিত। এখনও ক্ষেতপালে মা মগিনীর পূজা হয়।

শ্রুতিপরম্পরা জানা যায়, "সম্রাট অশোক ব্রহ্মদেশে যে সকল ধর্মদূত প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা জল পথে কিম্বা স্থল পথে যাবার সময় চট্টগ্রামে এই ধর্ম প্রচারিত হওয়া সম্ভব"।[১]

আরও বলা হয়-"খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মগধদেশ হতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ পূর্বদেশে এসে ধর্ম প্রচার করেছিলেন।"[১] "মগধদেশ হতে বিতারিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম এই চট্টগ্রামেরই ছায়া স্নিগ্ধ বুকে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল ; এই জন্যই চট্টগ্রাম বৌদ্ধমাত্রের নিকট পরম পবিত্র"।[২] "মগধদেশ হতে পলায়মান বৌদ্ধগণ ভারতের এক প্রান্তে এসে যে বুদ্ধভূমির অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাণপাত শ্রমস্বীকার করেছিলেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরই চট্টগ্রামের এই বৌদ্ধগণ"।[৩]

ইতিহাসের কষ্টিপাথরে নির্ণীত সিদ্ধান্ত এই যে, খৃষ্ট পূর্বাব্দে বৌদ্ধধর্ম পূর্ববংগে (চট্টগ্রামে) প্রচারিত হলেও তা বেশী প্রসার লাভ করতে পারে নাই। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে তথা চট্টগ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ হিউয়েনসাং "শ্রী চট্টল সমতটের দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত বহুসংখ্যক চৈত্য বিশিষ্ট পার্বত্য স্থান বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] এখানে "পণ্ডিত বিহার" নামে একখানি বৌদ্ধ শিক্ষায়তন ছিল, উক্ত শিক্ষায়তনে শিক্ষাপ্রাপ্ত সকলেই ছিলেন তন্ত্রযামী। সুতরাং তৎপূর্বেই যে এখানে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা দৃঢ়তা সহকারে বলা যায়।

খৃষ্টীয় অষ্টম হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ব ভারতে পাল আধিপত্য অক্ষুন্ন ছিল। সেই সময় ত্রিপুরা ও পূর্ব বাংলায় কয়েকটি বৌদ্ধ রাজবংশ রাজত্ব করতেন, যথা খড়গবংশ, দেববংশ, চন্দ্রবংশ প্রভৃতি। ১২২৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রবংশীয় দেবগণ চট্টগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই চন্দ্রবংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁদের কাছ থেকে ত্রিপুরারাজ রত্নফা (ধন্য মাণিক্য) ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। পরবর্তী দীর্ঘদিন ত্রিপুরা, আরাকান, চাক্‌মা ও পর্তুগীজদের মধ্যে চট্টগ্রামের আধিপত্য নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে এবং কয়েকবার হাত বদল হয়। অমর মাণিক্য কর্তৃক ১৬১২ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিজয় হচ্ছে ত্রিপুরা রাজাদের সর্বশেষ বিজয়। ত্রিপুরার রাজারা তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। এই বংশের রাজধন মানিক্য (১৬১২-১৬২৩) খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন।[১]

এই সময় চট্টগ্রামের মহাযান প্রভাবিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সংগে আরাকানের থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণে এদেশের বৌদ্ধধর্মে অর্থাৎ তান্ত্রিক

১-বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, পৃঃ ১১। ১-চট্টগ্রামের ইতিহাস পৃঃ১৩।, চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম পৃঃ ৬।, ২-ইসলামাবাদ, পৃঃ ২২। ঐ ৩-সংঘশক্তি, দ্বাদশ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা ১৯৪১ খৃঃ।, চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম পৃঃ ৭। ৪-বড়ুয়া জাতির ইতিহাস, পৃঃ ৫। ঐ, ১-চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম পৃঃ ১৩, ১৪।

বৌদ্ধধর্মে কিছুটা থেরবাদ প্রভাব পতিত হয়, অর্থাৎ এদেশের ভিক্ষুরা কিছু থেরবাদ আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করে, যেমন চীবর ধারণ, বিকালে অন্ন বর্জন, অর্থাৎ অন্ন ব্যতীত তখনকার ভিক্ষুরা আর সকল পানাহার করতেন। এইরূপ কয়েকটি থেরবাদ আচার পদ্ধতি গ্রহণ করাতে এখানকার ভিক্ষুদের মধ্যে এক বিলক্ষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

তখন ভিক্ষুদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী ছিল-মাথে, কামে ও পাঞ্জ্যাং। নিমন্ত্রণে যাওয়ার সময় মাথেগণ মস্তকোপরি বৃহৎ শ্বেতছত্র ধারণ করে গমন করতেন। কামেগণ মুকুট (হুতুক) ধারণ করতেন আর পাঞ্জ্যাংগণ মস্তক বস্ত্রাবৃত করে গমন করতেন। মাথে, মহাথের, মহাস্থবির একার্থবোধক শব্দ। বিশ বৎসর ভিক্ষু বর্ষা পূর্ণ হলে মাথে, মহাথের, মহাস্থবির, অভিধায় ভূষিত হন। দশবৎসর ভিক্ষুবর্ষা পূর্তি হলে কামে, থের, স্থবির অভিধা প্রাপ্ত হন এবং দশ বৎসরের নীচে সকলকে পাঞ্জ্যাং বা ভিক্ষু বলা হয়।

খৃষ্টীয় ১৬৬৬ অব্দে মোগলদের হাতে আরাকানীদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে এবং চট্টগ্রামের শাসন ক্ষমতা স্থায়ীভাবে মোগলদের হাতে চলে যায়। মোগলদের এই বিজয়ের ফলে চট্টলের বৌদ্ধ ঐতিহ্য চিরতরে স্তিমিত হয়, পণ্ডিত বিহার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ধর্মগ্রন্থ সমূহ বিনষ্ট হয় এবং তন্ত্রাচার্য, বজ্রাচার্যগণ যে যেদিকে পারে পলায়ন করেন। তখন চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের উপর নেমে আসে ঘোর অন্ধকারময় দুর্দিন। সেই অন্ধকারময় দুর্দিনে বৌদ্ধেরা কি সামাজিক জীবনে, কি ধর্মীয় অধিকারে, কি সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে, এক কথায় সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত ছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল তাদের ধর্ম-বিনয়, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, এক কথায় সবকিছু। তারা ভুলে গিয়েছিল থেরবাদ, ভুলে গিয়েছিল তন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান, শুধু রয়ে গিয়েছিল এক টুকরা গেরুয়া বসন। তা দিয়ে তারা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি সম্পাদন করত। তখন তাদের অভিধা ছিল "রাউলী" অর্থাৎ পুরোহিত। এখনও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের কাছে বৌদ্ধভিক্ষুরা "রাউলী" নামে পরিচিত।[১] শঙ্করাচার্যের বদরিকাশ্রমে রাউলীকে পূজারী বলা হয়েছে। ইউরোপীয় পর্যটক বালফ্‌ফীচ ব্রহ্মদেশের ভিক্ষুদিগকে "রোলী" বলেছেন।[২]

"শত বৎসরের মুসলিম অধিকারে ফল স্বরূপ চট্টলের মহাযান প্রভাবিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে, পণ্ডিত বিহার ক্রমশঃ অধপতিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই বিহারে কয়েক শতাব্দী ব্যাপী সঞ্চিত গ্রন্থরাজি বিনষ্ট হয়ে যায়, একটিও অবশেষে রইলনা, সুতরাং বাঙ্গালী বৌদ্ধদের নিকট আর কোন ধর্মগ্রন্থই রইলনা। তারা ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, ক্রমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধি ভুলে গেল, শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ ভুলে গেল,

---

১-চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম পৃঃ ১৭, ১৮। ২। ইন্ডিকা। ৩-হর প্রসাদ গ্রন্থাবলী পৃঃ ৪২৪।
৪-সদ্ধর্মের পুনরুত্থান পৃঃ ৬। চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম, পৃঃ ১৯।

তখন রইল জন কয়েক অশিক্ষিত ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত রাউলী পুরোহিত। তারা আপনার মত করে বৌদ্ধধর্ম গড়ে নিল।"[৩]

"কোন অশুভ মুহূর্তে বৌদ্ধ ধর্মাচারের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হলো তা এখনও অজ্ঞাত। এই বিবাহিত পুরোহিত নেপাল, তিব্বত, ভূটান, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি মহাযানী দেশে এখনও বিদ্যমান"।[৪] কিছু দিন আগেও এইরূপ পুরোহিত ভিক্ষু চাকমা বৌদ্ধ সমাজে বিদ্যমান ছিল, তারা রাউলী নামে পরিচিত ছিল। আমাদের দেশেও তা ছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন হতে, যেমন শঙ্খনদীর একটি ঘাটের নাম "রাউলীর পোয়ার ঘাট"। চট্টগ্রামের ভাষায় ছেলেকে 'পোয়া' বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় এখানে ও পূর্বে বিবাহিত পুরোহিত ছিল। এই সমস্ত পুরোহিতেরাই তদানীন্তন সমাজে নেতৃত্ব দিত।

চাকমা জাতির ইতিহাসে উল্লেখ আছে, "প্রাচীন যুগের বহু ধর্মগ্রন্থ বিলুপ্ত হলেও বর্তমানে যে সকল ধর্মগ্রন্থ আছে, তদ্দারা রাউলী সম্প্রদায়ের (অনুসম্পন্ন শ্রামণের) দ্বারাই ঐ সকল ধর্মকর্ম অর্থাৎ পৌরোহিত্য কার্য সম্পন্ন হতো"।[১] সেই সময়ে বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজে "মঘাখমৌজা" নামে এক প্রকার ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত ছিল। উহার সাহায্যেই তান্ত্রিক রাউলীগণ ধর্মীয় কার্য পরিচালনা করতেন ; সুতরাং দেখা যায় চট্টগ্রামের বৌদ্ধভিক্ষুকে "রাউলী" নামে ডাকা হতো। নিদর্শন স্বরূপ চট্টগ্রামসহ চন্দনাইশ উপজেলার জোয়ারা খানখানাবাদ গ্রামের দক্ষিণপার্শ্বে যে পাঁচজন মহাস্থবিরের স্মৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো 'খাদেরাউলীর মন্দির"। বড়ুয়া সমাজে যধরা রাউলী, খানরাউলী, খুদ্যারাউলী, চাঁনরাউলীর গোষ্ঠী বা বংশ পরম্পরা এখনও রয়েছে। সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির যখন প্রথমবার চট্টগ্রাম আসেন, তখন রাধাচরণ মহাস্থবির তাঁকে বৈদ্যপাড়া স্বীয় বিহারে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তখনকার ঘটনা সংঘরাজ সারমেধের আত্মজীবনীর ১০ম পৃষ্ঠায় আরাকানী অক্ষরে লিখিত আছে-"তথায় বড়ুয়া রাউলী রাধারাম তাঁদিগকে অভ্যর্থনা করেন।"[১] 'কোতোয়ালী ঘোনা গ্রামে ঈশাপুর রাস্তা সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে "রাউলীর পুকুর" নামে খ্যাত একটি সুপ্রাচীন পুকুর আছে। সম্ভবতঃ পুকুরটি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর চট্টগ্রামে আরাকানী শাসনকালে কোন বৌদ্ধ রাউলী খনন করেছিলেন বলে তার নামানুসারে এইটি "রাউলী পুকুর" নামে খ্যাত হয়েছিল।[২] চাঁন্‌গা বড়ুয়া পাড়ার পার্শ্বে আরাকান রোডের উপর যে সেতুটা আছে, তাও "রাউলীর পোল" নামে পরিচিত। এই ধরণের 'রাউলীর রাস্তা, রাউলীর পোল, রাউলীর হাট, রাউলীর দীঘি, রাউলীর পুকুর, রাউলীর ভিটা প্রভৃতির নিদর্শন তদানীন্তন বৌদ্ধ পুরোহিতগণের স্মৃতি বহন করে। এসব তথ্য

১-বুদ্ধের ধর্ম দর্শন, পৃঃ ৬। চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম, পৃঃ ২০। ১-বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, পৃঃ ১২। চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম, পৃঃ ২০। ২-চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসংগ, পৃঃ ২৭। চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম, পৃঃ ২১। ১-বাংলাদেশের বৌদ্ধধমে মহাস্থবিরদের অবদান, পৃঃ ৫।

থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাংলার মহাযান প্রভাবিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম একদিন উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। পরে আরাকানী থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কে এসে এর রং ঢংয়ের একটু পরিবর্তন ঘটেছিল বটে, কিন্তু শতবৎসরের মুসলিম শাসনের ফলে বৌদ্ধধর্ম যেরূপ নিয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পূর্বে তার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করেছি। শেষ যা অবশেষে ছিল তা হলো জন কথেক ভিক্ষু নাম ধারী বিবাহিত পুরোহিত। তারা আপনার মত করে বৌদ্ধধর্ম গড়ে ছিল। এই পুরোহিতেরাই পরে "রাউলী" নামে পরিচিত হয়।

বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির 'বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মে মহাস্থবিরদের অবদান' গ্রন্থের ভূমিকায় "রাউলী" শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে লিখেছেন 'রাউলী' শব্দটি এসেছে আউলিয়া শব্দ থেকে। আরব দেশাগত মুসলমানগণ তাঁদের ধর্ম প্রচারকগণকে আউলিয়া বলে সম্বোধন করতেন। এদেশে পদার্পণ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রচার কার্য দেখে ধর্মীয় গুরু বলে তাঁরা তাঁদেরকেও আউলিয়া বা দরবেশ বলে অভিহিত করেছিলেন। এই আউলিয়া পরবর্তী পর্যায়ে রাউলিয়া ও সর্বশেষে "রাউলী" হয়েছে। রাউলী হচ্ছে সাধক, প্রচারক ও সত্য পথের পথিক। মুসলমান ভাইদের সম্ভ্রমসূচক আউলিয়া সম্বোধন থেকে ক্রমে ক্রমে রাউলী শব্দ বৌদ্ধদের মধ্যে প্রবেশ করেছে।"[১] রাউলী শব্দ আউলিয়া থেকে আসুক আর দরবেশ থেকে আসুক, তাঁরাই ছিল তখনকার বৌদ্ধদের কুলপুরোহিত অর্থাৎ ধর্মীয় নেতা। এটা কেহ অস্বীকার করতে পারবে না।

ঐতিহাসিক সত্য এই যে, প্রায় দুই শতাব্দীকাল চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের উপর কোন না কোন প্রকারে আরাকানীদের আধিপত্য ছিল। তখন মহাযান প্রভাবিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপর কিছুটা থেরবাদ প্রভাব পড়েছিল, তা সহজে অনুমান করা যায়। তাও স্বধর্মী রাজার আনুকূল্য লাভের জন্য স্বীয় বেশভূষার কিছুটা পরিবর্তন করেছিলেন। বিকাল ভোজনের মধ্যে অন্ন ব্যতীত সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করতেন। অন্ন বর্জন থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের কারণে হয়েছিল, যেহেতু মহাযান পন্থীদের মধ্যে বিকাল ভোজনের উপর বাধা নিষেধ নাই। তদ্রূপ উপসম্পদা গ্রহণেরও কোন নির্দিষ্ট বয়সের সীমা ছিল না। পরবর্তী সময়ে থেরবাদ বিনয়মতে উপসম্পদা গ্রহণ করলেও তখন বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না ; কারণ "তখনকার ভিক্ষুরা থেরবাদ বিনয় না জানায় উপসম্পদার বয়স বিবেচনা করতেন না-১৫, ১৬, ১৭ বৎসর যে কোন বয়সে উপসম্পদা দিতেন। এমনকি আচার্য চন্দ্রমোহন (দ্বিতীয় সংঘরাজ) মহাস্থবির প্রথমবার ১৭ বৎসর বয়সে উপসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন। মহামান্য তৃতীয় সংঘরাজ জ্ঞানালংকার (লালমোহন) মহাস্থবির প্রথমবার ১৫ বৎসর বয়সে উপসম্পদা নিয়ে ছিলেন। রামমণি মহাস্থবিরের উপসম্পদা ১৮ বছর বয়সে হয়েছিল। তখনকার অধিক সংখ্যক ভিক্ষুর উপসম্পদা ২০

১-চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম, পৃঃ ২৩, ২৪।

বৎসরের কম বয়সে হয়েছিল। অধিকন্তু উপসম্পদার পর বিহারে এনে উপসম্পন্নকে পুনঃ দশশীল দিতেন। তাঁরা জানতেন না যে উপসম্পন্নকে দশশীল কিংবা পঞ্চশীল দিলে তার আর ভিক্ষুত্ব থাকেনা।"[১] "তবে কোন্ সময়ে, কোথায়, কার উপাধ্যায়ত্বে কে কে থেরবাদ বিনয় সম্মত উপসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন, উপসম্পদা দাতা ও গ্রহীতার পক্ষে তৎসম্বন্ধে স্বীকৃতির কি নিদর্শন আছে, এই সব প্রশ্ন শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার মহাস্থবির তাঁর "সদ্ধর্মের পুনরুত্থান" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।"[২]

সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির কর্তৃক থেরবাদ উপসম্পদা প্রতিষ্ঠা করার পরও কোন কোন মহাথের সেই চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করেছেন ঃ শ্রদ্ধেয় রামদাস মহাস্থবিরের শিষ্য মাননীয় জ্ঞানজ্যোতি (রমেশ চন্দ্র) মহাস্থবিরকে ১৭ বৎসর বয়সে তথাকথিত উপসম্পদা দেওয়া হয়। তিনি বৃদ্ধ বয়সে সদলবলে সংঘরাজ ভিক্ষু সংঘের নিকট থেরবাদ উপসম্পদা গ্রহণ করে তা সংশোধন করেন। যার ফলে রামদাস মাথের নিকায় নিঃশেষ হয়।

পূর্বাপর বিচার বিশ্লেষণে, ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণে দেখা গেল যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে আরাকানীদের সম্পর্কে আসার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের কোথাও থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের কোন নিদর্শন ছিল না। তারপরও যদি কেহ বলে যে, "আমরা বুদ্ধের পরম্পরা পুণ্যপুরুষ মোগ্গলী পুত্ততিস্স স্থবিরের পরম্পরাগত বংশধর।" এর উপর টীকাটিপ্পনী করা নিরর্থক। ধর্মকীর্তির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, "ধিক-ব্যাপকতম"। এর চেয়ে মূর্খতা আর কি হতে পারে। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্যেন দৃষ্টি চট্টগ্রামের উপর পতিত হয়। মুসলমান শক্তি তাঁদিগকে আর বেশীদিন আট্‌কিয়ে রাখতে পারেনি। অবশেষে বিনা বাধায় চট্টগ্রামের শাসন ক্ষমতা ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারে চলে যায়।

এদিকে পার্শ্ববর্তী আরাকানের রাজলক্ষ্মী গৃহবিবাদে, চঞ্চলা, চারিদিকে অশান্তি, অরাজকতা বিরাজ করছে, সেই সুযোগে ব্রহ্মরাজ বোধফ্রা (১৭৮২-১৮১৯) আরাকান আক্রমণ করেন এবং ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আরাকান অধিকার করেন। এই যুদ্ধে আরাকানী সৈন্যগণ ব্রহ্মি সৈন্যদের নিকট পরাজিত হয়। বিজিত ব্রহ্মী সৈন্যগণ পরাজিত আরাকানীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। এই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক আরাকানী ভিক্ষু ও গৃহস্থ বাংলাদেশের কক্সবাজার, রামু, হারভাং 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' বরিশাল প্রভৃতি স্থানে বাস করতে থাকেন। তখন আমাদের মহামান্য সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের মাতা-পিতা তাঁদের কুলগুরু শ্রদ্ধেয় সারালংকার মহাস্থবির মহোদয়ের সঙ্গে হারভাংয়ে এসে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আচার্য সংঘরাজ সারমেধের জন্ম হয়।

১-সদ্ধর্মের পুনরুত্থান, পৃঃ ৯। চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম, পৃঃ ২৮, ২৯।

এদিকে কিছুদিন পর ব্রহ্মী সরকারের সঙ্গে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সংঘর্ষ বেঁধে যায় এবং তা ক্রমে যুদ্ধে পরিণত হয়। সেই যুদ্ধে ব্রহ্মী সরকারের পরাজয় ঘটে, তার ফলস্বরূপ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বাগ্যিডও এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে "য্যান্ডবো" সন্ধি সাক্ষরিত হয়। সেই সন্ধির শর্তানুসারে আরাকান বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা সরকারের অধীন হয়। তারপর ধীরে ধীরে আরাকানে শান্তি স্থাপিত হয় এবং আরাকান ও চট্টগ্রামের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা হয়।[১] ইত্যবসরে ভাবী সংঘরাজ সারমেধ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আচার্য সারালংকার মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হন।

তখন বহু আরাকানী ভিক্ষু ও গৃহস্থ চট্টগ্রাম হতে আরাকানে চলে যান। সেই সঙ্গে আচার্য সারালংকার মহাস্থবির ও তদীয় শিষ্য ভিক্ষু সারমেধকে নিয়ে আরাকানে চলে যান এবং তথায় এক বিহার নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। আচার্য সারালংকার মহাস্থবির পরলোক গমন করলে সারমেধই সেই বিহারের অধ্যক্ষ হন। অল্পদিনের মধ্যেই সারমেধের যশঃ খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই ব্রিটিশ সরকার তাঁর গুণবত্তার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে "সারমেধালংকারাভিতি শাসনধর-মহাধম্মরাজাধিরাজ গুরু" এই মহান সম্মানিত নাম লাঞ্ছন (উপাধি) প্রদান করেন।

তখন সবেমাত্র কলিকাতা মহানগরীতে বাঙ্গালী বৌদ্ধদের দ্বারা ওয়ারিশ বাগানে "মহানগর বৌদ্ধ বিহার" নির্মিত হয়। ভিক্ষু চন্দ্রমোহন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ঐ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ হিসাবে কলিকাতা গমন করেন। তথায় অবস্থানকালে মিঃ পল নামে জরিপ বিভাগের একজন সাহেব অফিসার শ্রীলংকা হতে কলিকাতা আসেন। তিনি একজন বৌদ্ধধর্মানুরাগী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ভিক্ষু চন্দ্রমোহন তাঁর কাছে ধর্মবিনয় অধ্যয়ন করতেন। একদিন তিনি প্রাতিমোক্ষের ১১৪ তম শিক্ষাপদ পাঠ করেন; "যো পন ভিক্খু জানং উনবীসতি বস্সং পুগ্গলং উপসম্পাদেয্য সোচ পুগ্গলো অনুসম্পন্নো তে চ ভিক্খু গারয্হা ইদং তস্মিং পাচিত্তিয়ন্তি"। অর্থাৎ যে কোন ভিক্ষু (উপাধ্যায়) জানিয়া বিংশতি বর্ষের কম বয়স্ক ব্যক্তিকে ভিক্ষুত্ব প্রদান করেন, সেই ব্যক্তি ভিক্ষুর মধ্যে গণ্য হবে না, যেই ভিক্ষুরা ভিক্ষুত্ব দেন, তাঁরাও নিন্দিত হন, সেই বিষয়ে উপাধ্যায়ের পাচিত্তিয় আপত্তি হয়। এতে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং সাহেবকে বলেন যে তিনি ১৭ বৎসর বয়সে ভিক্ষু হয়েছেন। উত্তরে সাহেব বলেছেন, "তবে আপনি ভিক্ষু হননি"। এতে বুঝতে আর বাকী রইল না। সত্যই তিনি ভিক্ষু হননি, ভিক্ষু হতে হলে বিনয় বিধান মতে পাঁচটি বিষয়ে পূর্ণতা অর্জন করতে হয়, যথা-(১) বস্তু সম্পত্তি-উপসম্পদা প্রার্থির যোগ্যতা অর্থাৎ তাঁর বয়স বিংশতি বৎসর পূর্ণ হতে হবে। (২) ঞতি সম্পত্তি-যথাযথ সংঘকে জ্ঞাপন করা। (৩) অনুসাবন সম্পত্তি-সংঘের অনুমোদন। (৪) পরিসা সম্পত্তি-পরিষদ সম্পত্তি অর্থাৎ মধ্যদেশে দশজন এবং প্রত্যন্ত দেশে অন্ততঃ পাঁচজন শীলবান ভিক্ষুর উপস্থিতি এবং (৫) সীমা সম্পত্তি-সংঘ কর্তৃক

কর্মবাক্য পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কৃত স্থান। এই পঞ্চাংগ পরিপূর্ণ হলেই স্থবির পরম্পরা বিনয়বিধান মতে উপসম্পদা বা ভিক্ষুত্ব লাভ ঘটে, অন্যথা নহে। এতে ভিক্ষু চন্দ্র মোহন স্থির নিশ্চিত হলেন যে, তিনি "ভোবাদি নাম সো ভিক্ষু" অর্থাৎ তিনি নামে মাত্র ভিক্ষু, প্রকৃত ভিক্ষু নন। তিনি প্রকৃত ভিক্ষু দীক্ষা নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়লেন, কিন্তু লংকা-ব্রহ্মা ছাড়া তা সম্ভব নয়, তাই তিনি মিঃ পলের পরামর্শক্রমে পুনঃ ভিক্ষু দীক্ষা গ্রহণের জন্য ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ চট্টগ্রাম হয়ে আরাকান গমন করেন।

ভিক্ষু চন্দ্রমোহন আরাকানে গিয়ে সারালংকার বিহারে উপস্থিত হয়ে সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরকে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং চট্টগ্রামের ভিক্ষু সংঘ ও বৌদ্ধধর্মের দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করেন। অতঃপর ভিক্ষু চন্দ্রমোহন সারমেধ মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে উদক উক্ষেপ সীমায় পুনঃ উসম্পদা গ্রহণ করেন।

অতঃপর ভিক্ষু চন্দ্রমোহন কিছুদিন তথায় অবস্থানের পর অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্বদেশ চট্টগ্রাম চলে আসেন এবং আত্মীয় স্বজনদের অনুরোধে চীবর ত্যাগ করে কিছুদিন পিতার কাছে কবিরাজী শিক্ষা করে কলিকাতা গিয়ে কবিরাজী ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু যাঁর জন্ম বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, তিনি কি করে সাধারণ কবিরাজী জীবন কাটাতে পারেন? সুতরাং পিঞ্জরাবদ্ধ বিহংগের ন্যায় তাঁর মানস পাখী চটপট করতে থাকে।

সেই সময় শ্রীলংকাবাসী ভিক্ষু শরণাংকর স্বীয় উপসম্পদায় শংসয়াপন্ন হন এবং ভাবলেন "যার জন্য পার্থিব ভোগ বিলাস বিসর্জন দিয়ে ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেছি সেই বিনায়ানুকূল উপসম্পদায় যদি প্রতিষ্ঠিত না হই, তবে কৃত্রিম বেশ ধারণের প্রয়োজন কি?"

সেই সময় শ্রীলংকায় বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধি কামী বহু সৎপুরুষ এক সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, "ব্রহ্মদেশে মহাবিহারবাসী ভিক্ষু পরম্পরা অবিচ্ছিন্নভাবে আজও বিদ্যমান ; সুতরাং আয়ুষ্মান শরণাংকর ভিক্ষুকে শীলস্কন্ধ ও ধর্মদর্শী ভিক্ষু, ধর্মপাল ও সুমংগল শ্রামণের এবং দুইজন সেবক সহ ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করা হউক।" সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী উক্ত ভিক্ষু শ্রামণের সহ স্বীয় আচার্যের নিকট হতে প্রমাণ পত্র নিয়ে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে ব্রহ্মদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে কলিকাতা মহানগরীতে উপনীত হন। কলিকাতায় মিঃ পলের ভবনে তাঁদের সংগে চন্দ্রমোহনের দেখা হয়। তাঁর সাধুতা ও ধর্মভাব দেখে তাঁকে সহ কুশীনারাবাসী চন্দ্র নামক উপাসককে সংগে নিয়ে শ্রীশরণাংকর নৌ-যানে ব্রহ্মদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

১-সংঘরাজ পুন্নাচার জীবনী, পৃঃ ১৮।

"জম্বুদীপং গতাতত্থ কোসিনারো উপাসকো
চন্দনামোসি সদ্ধালু পব্বজায় অপেক্খকো ;
সব্বেতে একতো হুত্বা মরম্মরট্ঠ মুপাগমুং।"[১]

তাঁরা যথাসময়ে রেঙ্গুন হয়ে ব্রহ্মের তদানীন্তন রাজধানী মান্দালয়ে ব্রহ্ম ভিক্ষু সংঘের প্রধান মহামান্য সংঘরাজ **"জ্ঞেয় ধর্মাভিসুরি বরজ্ঞান কীর্ত্তি শ্রী প্রবরালংকার ধর্মসেনাপতি মহাধর্মরাজাধি রাজগুরু"** এর আশ্রমে সংঘরাজারামে উপস্থিত হন এবং তাঁদের অবস্থানের ব্যবস্থা করে দেন এবং চারি মাসকাল অবস্থানের পর ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৪০৩ বুদ্ধাব্দের-জ্যৈষ্ঠ মাসে সংঘরাজের উপাধ্যায়ত্বে ৭৩ জন স্থবির মহাস্থবিরের উপস্থিতিতে রাজকীয় মর্যাদা সহকারে তাঁরা সাত জনকে উপসম্পদা প্রদান করেন। এই সময় ভিক্ষু চন্দ্রমোহন, সংঘরাজ ও ব্রহ্মরাজ মিন্‌ডন মিনকে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচার আচরণ এবং বৌদ্ধদের দুরাবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করেন। সংঘরাজ তাঁর নির্মল স্বভাব দর্শন করে এবং বিনয় ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখে সংঘ সভার পক্ষ থেকে তাঁকে "পুন্নাচার ধর্মধারী" উপাধি প্রদান করেন। তারপর থেকে ভিক্ষু চন্দ্রমোহন "পুন্নাচার ধর্মধারী" অভিধায় অভিহিত হন। এতৎ সত্ত্বেও মাননীয় বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির কোথা হতে আবিষ্কার করলেন-"চট্টগ্রামের প্রাচীনপন্থী ভিক্ষুরাই আচার্য চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরকে শ্রীলংকায় পাঠিয়েছিলেন ধর্ম ও বিনয় শিক্ষার মানসে।"[১] এ ধরনের সস্তা ওকালতী দ্বারা জাগ্রত বৌদ্ধ সমাজকে আর বেশী দিন ভুলিয়ে রাখা যাবে না।

অতঃপর তাঁরা সকলেই শ্রীলংকাভিমুখে গমন করেন এবং যথাসময়ে শ্রীলংকার গালে নগরে বিজয়ানন্দ বিহারে উপস্থিত হন। তখন ধর্মবিনয়ে শ্রীলঙ্কাবাসী ভিক্ষুদের যথেচ্ছাচার দর্শন করে তাঁরা কারও সঙ্গে ধর্ম ও আমিষ সম্ভোগ হতে বিরত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করতে থাকেন। ক্রমে তাঁরা সংখ্যায় পুষ্ঠ হয়ে "রামায় নিকায়" অভিধায় অভিহিত হন। ভিক্ষু চন্দ্রমোহন তথায় পাঁচ বৎসরাধিক কাল অবস্থান করে বহু অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে স্বীয় জন্মভূমি চট্টগ্রামে চলে আসেন।

তৎপূর্বেই মহামান্য সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির চট্টগ্রাম পদার্পণ করেছিলেন। তখন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের চৈত্র মাস। তিনি বুদ্ধগয়া হতে দেশে ফেরার পথে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড তীর্থে উপস্থিত হন। তথা হতে শ্রদ্ধেয় রাধাচরণ মহাস্থবির তাঁদিগকে সঙ্গে নিয়ে বৈদ্যপাড়া স্বীয় বিহারে উপস্থিত হন এবং বিষূব সংক্রান্তির পূর্ব পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। তখন চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনসাধারণ কোনটি প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম, কোনটি বিকৃত বৌদ্ধধর্ম, তা সম্যক বুঝতে না পেরে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকেন। এই সময় মহামান্য সংঘরাজের

১-বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মে মহাস্থবিরের অবদান-পৃঃ ১৬।

আগমন সংবাদ বৌদ্ধ জনসমাজে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং প্রত্যহ জন সমাগম হতে থাকে। সেই সমাগমে সারমেধ মহাস্থবির প্রত্যহ ভাষণ দিতেন- তথাগত প্রদর্শিক ধর্ম বিনয় সম্বন্ধে। সভাশেষে আলোচিত হতো চট্টগ্রামের ভিক্ষুদের পুনঃ উপসম্পদার প্রয়োজনীয়তা। এভাবে চলতে থাকে তাঁর দৈনন্দিন জীবনচর্যা। ইতিমধ্যে পাহাড়তলী নিবাসী স্বনামধন্য কালীচরণ মুৎসুদ্দী পাহাড়তলীতে বর্ষাবাসের জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি তাঁর নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন এবং যথাসময়ে পাহাড়তলীতে পদার্পণ করেন।

পাহাড়তলী মহামুনি মেলায় বড়ুয়া, চাকমা, মান, বোমাং প্রভৃতি বৌদ্ধদের মিলন তীর্থ। প্রতি বৎসর বিষুব সংক্রান্তি উপলক্ষে তথায় বিপুল জন সমাগম হয়, সেই বৎসর সারমেধ মহাস্থবিরের আগমন সংবাদে সেই সংখ্যা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বৃদ্ধি পায়। এই মহা জনসমাগমে প্রত্যহ তিনি উপদেশ দিতেন বুদ্ধ তথাগতের অমৃতময় বাণীর এবং আলোচনা করতেন ভিক্ষুদের বিনয় বিধান ও গৃহীদের শীলাচার সম্বন্ধে, অধিকন্তু চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের শাসন সংস্কার করে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সমাজে (ভিক্ষু গৃহী) নানা কুসংস্কার ও মিথ্যাদৃষ্টি সম্মত পূজা-পার্বণ, ভিক্ষুদের মধ্যে বিনয় বহির্ভুত বিধি-বিধান প্রচলন, এমনকি তাঁরা তাঁদের মধ্যে উপসম্পদা দানের বিধি-বিধান পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন, তাঁরা জানেন না যে, কিভাবে ও কত বৎসর বয়সে উপসম্পদা দিতে হয়। বিনয় বিধান মতে বিশ বৎসরের কম বয়স্ক যে কোন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিলে সেই ব্যক্তি ভিক্ষু পদ লাভের অধিকারী হবে না এবং এতাদৃশ অভিক্ষুগণ পূরক ভিক্ষু দ্বারা কোন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিলে তিনিও ভিক্ষু হন না ইত্যাদি বিনয় বহির্ভূত ও বিনয় সম্মত বহু বিষয়ের আলোচনা হয়। তাঁর এই ধর্ম সংস্কার মূলক আলোচনা সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই ভাবের আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট শাক্যমুনি মন্দিরের পার্শ্বে নির্মিত ধর্মশালায় তিনি দুই বাৎসরিক কাল অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বড়ুয়া, চাকমা, মান ও বোমাং সমাজের সর্বত্র বিচরণ করে মহাযান অধ্যুষিত তান্ত্রিক মতের অসারতা, বিশেষতঃ নানা দেব-দেবীর পূজায় পশুবলির বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালান। এর ফলে প্রায় বৌদ্ধ জমিদার বাড়ী হতে কালীপূজা, দুর্গাপূজা, শিবপূজা প্রভৃতি তিরোহিত হয়।

এই সময় চাকমা রাজবংশের পুণ্যশীলা মহিলা কালিন্দী রাণী ছিলেন চাকমা সার্কেলের শাসনকর্ত্রী। তিনি সারমেধ মহাস্থবিরের কীর্তিগাথা শুনে তাঁকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন এবং সেই সঙ্গে বহু স্থবির মহাস্থবিরও সেখানে নিমন্ত্রিত হন। সারমেধ মহাস্থবির সেই সমবেত ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রকৃত বিনয় কি, অবিনয় কি, যথার্থ ভিক্ষুর সংজ্ঞা কি, কত বৎসর বয়সে উপসম্পদা গ্রহণ করতে হয় ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করে

বক্তৃতা করেন। তা শুনে সকলের মনে এক অন্তর্জাগৃতির সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীকালে কার্যে পরিণত হয়েছিল।

রাণী মহোদয়া তাঁর সুমধুর ধর্মোপদেশ ও বিনয় ব্যবহারে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তারই ফলে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে রাজকীয় পুণ্যাহ উপলক্ষে মহাসমারোহে তাঁকে আরাকানী ভাষায় উপাধিযুক্ত শীলমোহর প্রদানে সম্মানিত করেন।

1219 A. F. THE SEAL OF ARAKANEESE SANGHARAJA AND VINAYDHARA.

এ হল তাঁর দ্বিতীয় সম্মানিত উপাধি। এই উপাধি লাভের কিছুদিন পর তিনি আরাকানে চলে যান। তাঁর এই পর্যটনে গৃহীরা কিছুটা সংস্কৃতমনা হলেও চট্টগ্রামের তথাকথিত স্থবির, মহাস্থবিরেরা থেরবাদ অনুসারে সমগ্রভাবে পুনঃ উসম্পদা গ্রহণে সম্মত হতে পারেন নি। তিনি চলে গেলে চট্টলের ভিক্ষু-গৃহী উভয়ের মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়, বহু বাকবিতণ্ডার পর কর্ণফুলী নদীর উত্তর কূলের প্রধান প্রধান স্থবির মহাস্থবিরগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাঁরা থেরবাদ বিনয় অনুসারে সমগ্রভাবে পুনঃ উপসম্পদা নেবেন এবং সংঘরাজ সারমেথ মহাস্থবিরকে উপসম্পদা প্রদানের উপযুক্ত ভিক্ষু নিয়ে চট্টগ্রামে আগমনের আহবান জানান। তিনি তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিনয়কর্মের উপযোগী ভিক্ষু সমভিব্যহারে জল পথে দ্বিতীয় বার চট্টগ্রামে আগমন করেন। তাঁরা যথাসময়ে মহামুনি পাহাড়তলী এসে তাঁদের জন্য পূর্বনির্মিত বিহারেই উপস্থিত হন।

অতঃপর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুসারে গৃহীত হয় যে মহাযান অধ্যুষিত চট্টগ্রামের তান্ত্রিক পুরোহিত ভিক্ষুগণ পূর্ব শিক্ষাপদ (বর্ষাবাস) ত্যাগ করে পুনরায় থেরবাদ সম্মত উপসম্পদা গ্রহণ করে দেশে পরিশুদ্ধ থেরবাদ সম্মত ভিক্ষুসংঘের (বৌদ্ধধর্মের) পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন। উপসম্পদার সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়েছে চতুর্দিক হতে ভিক্ষুরা এসে মহামুনি পাহাড়তলীতে জড়ো হয়েছেন ; কিন্তু একটি জটিল সামাজিক কারণে অর্থাৎ যস্যা (বিড়ল্যা) তালুকদারের অর্থহানিকর সামাজিক দণ্ডমুক্তির ব্যাপারে রামদাস মাথে ও তিতন মাথে তাঁদের অনুযায়ী ভিক্ষুগণ সহ উপসম্পদা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন নাই। তা সত্ত্বেও অন্যান্য ভিক্ষুরা পূর্ব শিক্ষাপদ (বর্ষাবাস) ত্যাগ করে পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত-যথা সময়ে উপসম্পদার আয়োজন হয় এবং মহামুনি মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বের হাঞ্চার ঘোনার এক পার্বতীয় ছড়াই উপসম্পদার যোগ্য স্থান বিবেচিত হয়। সংঘরাজের নিজের ভাষায় "নদী সীমায়।" নদী সীমা কারও দ্বারা স্থাপন করতে হয় না, নদী স্বভাব সীমা-চতুর্দিকে জল সিঞ্চন

১। বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মে মহাস্থবিরদের অবদান, পৃঃ ১৫।

২। বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মে মহাস্থবিরদের অবদানের ভূমিকা, পৃঃ ১৬।

করে বিনয় কর্ম সম্পাদন করতে হয়। উক্ত নদী সীমা সম্বন্ধে আজকাল নানামুনির নানা মত দেখা যায়, যা বিনয়সম্মত নয়। প্রিয়ানন্দ মহাথের ও ধর্মপাল মহাথের লিখেছেন "পরম শ্রদ্ধেয় সারমিত্র মহাস্থবির মহোদয়ের আগমনের বহু পূর্বেই পাহাড়তলী মহামুনিতে ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে এই সীমাতে উপসম্পদা প্রদান হতো।"[১] একে ফলাও করে বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির লিখেছেন, "আমি শ্রমণ হবার পূর্বে থেকেই মহামুনি পাহাড়তলীর হাঞ্চার ঘোনা ঠাকুর গড়ানী (ভিক্ষু সীমা) দেখে আসছি। এই সীমায় বাংলা নববর্ষের দ্বিতীয় দিনে উপসম্পদাকর্ম সম্পাদন করা হতো। প্রাচীন ভিক্ষুদের দ্বিধা বিভক্তির পরও এই নিয়ম অব্যাহত ছিল। যে নিকায়ের ভিক্ষুরা সীমা আগে দখল করতে পারতেন তাঁরাই আগে উপসম্পদার কাজ করতেন। তারপর অন্যনিকায়ের ভিক্ষুরা আসতেন সেখানে। আমি শ্রমণ হবার পরও এই নিয়ম কিছুকাল বলবৎ থাকতে দেখেছি।"[২]

আমার জিজ্ঞাস্য প্রিয়ানন্দ মহাথের ও ধর্মপাল মহাথের উক্ত ভিক্ষুসীমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন যথার্থ স্থান নির্দেশ করলে আমাদের বড় উপকার হতো। আমরা জানি ঐতিহাসিক সত্য এই যে, পুণ্যশীলা কালিন্দী রাণীর বদান্যতা ও আচার্য চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরের প্রচেষ্টায় সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের মধ্যস্থতায়, আরাকান, কক্সবাজার ও রামু হতে আনিত ভিক্ষুসংঘ ও চট্টগ্রামের সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুসংঘ সম্মিলিতভাবে রাজানগর রাজবিহারের পশ্চিম পার্শ্বে ১৮৬৯ ইংরেজীতে সর্বপ্রথম বিনয় সম্মত (পাষাণ নিমিত্ত) ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে ভিক্ষুরা নদী বা ছড়াতেই বিনয় কর্ম সম্পাদন করতেন। তবে নদী বা ছড়ায় সীমার কোন চিহ্ন বা নিমিত্ত থাকে না। মাননীয় বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির কিভাবে হাঞ্চরঘোনার সেই ছড়াতে ভিক্ষু সীমা দেখলেন, এটা বুদ্ধির অগোচর। "কিমাশ্চর্যমতঃপরম।"।

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির শ্রীলংকা হতে ধর্মবিনয় শিক্ষান্তে দেশে ফিরে ১৯৩২ ইংরেজীতে পাহাড়তলী মহামুনীতে পালি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে পালিভাষা শিক্ষা দেন ; ১৯৩৩ ইংরেজীতে আমি তথায় যোগদান করে পালিবাংলা ভাষা অধ্যয়ন করি। সেখানে প্রবীন প্রজ্ঞারত্ন মহাস্থবিরও (গগন ঠাকুর) ছিলেন। তাঁর কাছে আমরা সারমেধ মহাস্থবিরের কথা, জ্ঞানালঙ্কার প্রমুখ সাতজন স্থবির, মহাস্থবিরগণ পূর্বশিক্ষাপদ ত্যাগ করে পুনঃ শিক্ষাপদ গ্রহণ করে ভিক্ষু হওয়ার কথা, সংঘরাজ নিকায় প্রতিষ্ঠার কথা, হাঞ্চারঘোনা প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কাহিনী শুনতাম। তাই একদিন আমরা কয়েকজন সেই ঐতিহাসিক হাঞ্চার ঘোনার সীমা (ঠাকুর গড়ানী) দেখতে গেলাম। পাহাড়তলী গ্রামের পূর্বপার্শ্বে যে পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান, যেখানে এখনও একটি তালবৃক্ষ বিদ্যমান, তার পূর্বদিকে ছোট এক ছড়া প্রবাহিত ছিল। উক্ত ছড়া সম্ভবতঃ পূর্বে আরও প্রশস্ত ছিল। তখন অতি ছোট, এখন বোধ হয় তার অস্তিত্বই

নেই। সেই ছড়াতেই (নদী সীমায়) শ্রদ্ধেয় 'লালমোহন মাথে-(জ্ঞানালংকার মহাস্থবির মহামুনি পাহাড়তলী, হরিমাথে-ধর্মপুর, সূক্ষ্মমাথে-মির্জাপুর, দুরাজমাথে-গুমানমর্দন, হরিমাথে-বিনাজুরী, কমল ঠাকুর-মহামুনি পাহাড়তলী, অভিচরণ মাথে দমদমা, এই সাতজন তথাকথিত মহাযানী পুরোহিত স্থবির, মহাস্থবিরগণকে তাঁদের পূর্ব শিক্ষাপদ (বর্ষাবাস) ত্যাগ করে থেরবাদ সম্মত বিনয় বিধান মতে পুনঃ উপসম্পদা প্রদান করা হয়েছিল। এতদিন পরই বাংলার মহাযান অধ্যুষিত তান্ত্রিক রাউলী পুরোহিতগণ প্রকৃত থেরবাদ সম্মত উপসম্পদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। সেই সকল উপসম্পন্ন ভিক্ষুসংঘের নাম হল **"সংঘরাজ নিকায়"** আচার্য সারমেধ মহাস্থবির হলেন সেই নিকায়ের প্রথম সংঘরাজ। তিনি আরও এক বৎসরকাল চট্টগ্রামে অবস্থান করে ভিক্ষুদিগকে ধর্মবিনয় শিক্ষা দেন। ইতিমধ্যে আরও কতিপয় স্থবির-মহাস্থবির সশিষ্যে তাঁর কাছে পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ করে সংঘরাজ নিকায়ে যোগদান করেন। কিন্তু পূর্বোক্ত মহাস্থবিরগণ কতিপয় গোড়াপন্থী দায়কের প্ররোচনায় কল্পিত মর্যাদা হানির ভয়ে সংঘরাজের নিকট উপসম্পদা গ্রহণের পূর্ব সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে পৃথক রয়ে যান। তাঁরা হন "মাথের দল" অর্থাৎ "রামদাস মাথে" ও "তিতন মাথে" এর দল। পরবর্তীকালে "রামধন মাথে" ও কতিপয় শিষ্য প্রশিষ্য নিয়ে তাঁদের দলপতি হয়ে "রামধন মাথে" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত লাখেরা নিবাসী অভয়াচরণ মাথেকে তদঞ্চলের ভিক্ষু সংঘের অধিনায়ক হিসেবে বেশ কিছুদিন গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। তাঁর অনুসারী দিগকে "অভয় মাথের দল" বলা হতো। সুতরাং তাঁরা লোক সমাজে যথাক্রমে "রামদাস মাথের দল" অর্থাৎ "দাস্যা মাথের দল" "তিতন মাথের দল" "রামধন মাথের দল" ও "অভয় মাথের দল" নামেই পরিচিত ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে দাস্যা মাথের দলের স্থবির, মহাস্থবিরগণ পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ করে সংঘরাজ নিকায়ে যোগদান করেন আর কিছু তিতন মাথের দলের সঙ্গে মিলে যান। রামধন মাথে ও অভয়াচরণ মাথের দলের ভিক্ষুরা পূর্বেই তিতন মাথের দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। বর্তমান তাঁরা "মাথের দল" বা "মহাস্থবির নিকায়" নামে পরিচিত। এই হল "নিকায়" বা "দল" সৃষ্টির ইতিবৃত্ত।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পূন্নাচার ধর্মধারী চন্দ্রমোহন মহাস্থবির শ্রীলংকা হতে স্বদেশ চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে যখন এই পরিশুদ্ধ সংঘরাজ নিকায়ে যোগদান করেন, তখন দুর্বারগতিতে এর স্রোত প্রবাহিত হয় এবং এর ফলে চট্টগ্রামের পূর্বে ও দক্ষিণাঞ্চলের অনেক স্থবির, মহাস্থবির স্বশিষ্যে পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ করে সংঘরাজ নিকায়ে যোগদান করেন। মহাস্থবির চন্দ্রমোহন তাঁদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং ভিক্ষু সংঘ তাঁকে আচার্যের পদে বরণ করেন। তদবধি তিনি "আচার্য চন্দ্রমোহন" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অতঃপর আচার্য চন্দ্রমোহন গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করে যখন

রাজানগর রাজ বিহারে গিয়ে পৌঁছেন, তখন মহারাণী কালিন্দিরানী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁর অমৃতময় ধর্মবাণী শ্রবণ করে অত্যধিক প্রীতি লাভ করেন। তারপর আচার্য প্রবরকে রাজগুরু পদে বরণ করে তথায় অবস্থানের নিমন্ত্রণ করেন। মহারাণীর নিমন্ত্রণ স্বীকার করে তিনি কিছুদিন তথায় অবস্থান করে ভিক্ষুসংঘকে ধর্মবিনয় শিক্ষা দেন। ইতিমধ্যে রাজকীয় আড়ম্বর সহকারে ১২৭৩ বঙ্গাব্দে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মন্দির উৎসর্গ কার্য সম্পাদন করেন। সেই সময় আচার্য চন্দ্রমোহন একটি সীমা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা মহারাণীর গোচরীভূত করেন। তাতে মহারাণী স্বীকৃতি দান করেন এবং সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরকে বিদিত করান এবং প্রয়োজনীয় ভিক্ষুগণ সহ চট্টগ্রাম আগমনের নিমন্ত্রণ জানান। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আরাকান, কক্সবাজার এবং রামু হতে পঁচিশ জন বিনয়ধর স্থবির মহাস্থবিরসহ তৃতীয়বার চট্টগ্রাম আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে আগত ভিক্ষু এবং চট্টগ্রামস্থ সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষু সম্মিলিতভাবে ১৮৬৯ ইংরেজীর ৮ই চৈত্র শাক্যমুনি মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের অধ্যক্ষতায় এবং পূণ্যাচার ধর্মচারী আচার্য চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম বিনয় সম্মত পবিত্র ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সীমায় "চিং" নাম তাঁরই প্রদত্ত। এই সীমাই বাংলাদেশীয় বৌদ্ধদের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক পাষাণ নিমিত্ত ভিক্ষু সীমা।

বুদ্ধের পঁয়তাল্লিশ বৎসর জীবনচর্যায় দেখা যায়, বর্ষাব্রত সমাপনান্তে ভিক্ষুরা বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তাঁদের মধ্য থেকে কেহ কেহ বুদ্ধ যখন বর্ষাবাসের পর চারিকায় (ধর্মপ্রচারার্থ) বের হতেন, তখন তাঁর অনুগমন করতেন। আর কেহ কেহ বুদ্ধের কাছ থেকে কর্মস্থান নিয়ে ভাবনায় রত হতেন। অবশিষ্ট ভিক্ষুরা স্ব স্ব বিহারে গিয়ে বাস করতেন। এই নীতিমালা অনুসরণ করে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানালংকার মহাস্থবির ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "সংঘ সম্মিলনী" নাম দিয়ে ভিক্ষুদের মধ্যে মিলনের (ভাবের আদান প্রদানের) এক যোগসূত্র রচনা করেন। তারই ফলস্বরূপ সংঘরাজ নিকায়ের এদিকের (উত্তর প্রান্তের) ভিক্ষুরা বর্ষাবাসের পর প্রবারণা সমাধা করে পাহাড়তলী মহানন্দ সংঘরাজ বিহারে সম্মিলিত হতেন। সেই সম্মেলনে ভিক্ষুরা কে কোথায় কিভাবে আছেন, কোথায় কি হয়েছে, কোথায় কি করতে হবে ইত্যাদি ধর্মীয় ও সামাজিক বহু বিষয়ের আলোচনা হতো। পরিশেষে সম্মেলনের সিদ্ধান্তানুসারে যাঁকে যেখানে পাঠাতে হতো, তাঁকে সেখানে সংঘের নির্দেশমত পাঠাতেন। ঐ নীতিমালা এখনো অনুসরণ করা হয়, অর্থাৎ এখনও প্রতি বৎসর পাহাড়তলী মহানন্দ সংঘরাজ বিহারে ভিক্ষুরা প্রবারণার পরের দিন সম্মিলিত হন।

তখনকার দিনে আজকালকার মত যাতায়াতের তেমন সুবন্দোবস্ত ছিল না, তাই বর্ষাবাসের পর চট্টগ্রামের সমস্ত ভিক্ষুরা এক সঙ্গে এক স্থানে সম্মিলিত হতে পারতেন না, তাই রাঙ্গুনীয়া, উনাইনপুরা, সাতবাড়িয়া,

সাতকানিয়া, বাঁশখালী, রামু, উখিয়া, নিজামপুর প্রভৃতি যেই যেই স্থানে সংঘস্থবির বাস করতেন, সেই সেই স্থানে ভিক্ষুরা সম্মিলিত হয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। সেই সকল সম্মিলন বা সমাগমই পরবর্তী পর্যায়ে এসে সভা, সমিতির রূপ নেয়, যেমন সংঘ সম্মিলনী, জিন শাসন সমাগম, জম্বুদ্বীপ ভিক্ষু মহামণ্ডল, সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা, প্রজ্ঞাতিষ্য স্মৃতি সমিতি, রাঙ্গুনীয়া ভিক্ষু সমিতি, পূণ্নাচার ভিক্ষু সংসদ, নিজামপুর ভিক্ষু সমিতি, সাতকানিয়া ভিক্ষু সমিতি, অভয়তিষ্য স্মৃতি সমিতি, বাঁশখালী ভিক্ষু সমিতি, রাখ্যাং মারমা সংঘ কাউন্সিল, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিক্ষু সমিতি, এ ধরণের আরও বহু সভা-সমিতি গড়ে উঠেছিল। এ গুলি কোন নিকায় বা দল নহে, স্থানীয় প্রশাসনিক সংগঠন বা সংস্থা মাত্র। এ গুলিকে নিকায়ভেদ মানা মূর্খতা বই আর কি?

সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির চট্টগ্রাম আগমনের পূর্বে এখানকার ভিক্ষুদের কাছে এক "মঘা খম্মৌজা" ছাড়া আর কোন ধর্ম গ্রন্থই ছিলনা। সুতরাং চট্টগ্রামের ভিক্ষুরা সারমেধ মহাস্থবিরের কাছেই সর্বপ্রথম ধর্মবিনয় সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞানার্জন করেন। আচার্য পূণ্নাচার ধর্মধারী চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরই এ দেশে পালিভাষা তথা ধর্মবিনয় শিক্ষা দানে প্রথম পথিকৃত আচার্য। তার আগে যে দুই একজন বাঙ্গালী ভিক্ষু আরাকান সফর করে এসেছিলেন, তাঁরা কেহ ধর্মবিনয় শিক্ষা করে এদেশে এসে ধর্মবিনয় শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার কোন নজির নাই। আচার্য চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরই সর্বপ্রথম ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীলংকা হতে স্বদেশ চট্টগ্রাম এসে পাহাড়তলী মহামুনিতে (পালিভাষা) ধর্মবিনয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তখনকার চট্টগ্রামের শিক্ষা-ভিলাষী প্রায় ভিক্ষুরাই তাঁর কাছে এসে ধর্মবিনয় শিক্ষা করেছিলেন। তাই তিনি সর্বসাধারণের কাছে "আচার্য" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তখনও কোন বৌদ্ধ ধর্মীয় বইপত্র এদেশে ছাপার অক্ষরে বের হয়নি।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দ মুৎসুদ্দী ও গোবিন্দ চন্দ্র বড়ুয়া (পাহাড়তলী) মিলিতভাবে "পাতিমূখ" নামে (বিনয়ের কয়েকটি সূত্র) বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। এর অল্পদিন পর কাশীমোহন মুন্সী "উবুশীল" অর্থাৎ উপোসথ শীল নামক অপর একটি বই প্রকাশ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দ মুৎসুদ্দীর "প্রাতিমোক্ষ" নামক বইটি প্রকাশিত হয়। এভাবে ভিক্ষুরা ক্রমে শিক্ষার আলো পেতে থাকেন। তৎপূর্বে ভিক্ষুরা ধর্মবিনয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, অবশ্য সময় সময় আরাকানী থেরবাদী ভিক্ষুদের সম্পর্কে এসে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে, যেমন বিকাল ভোজন বন্ধ করেন, নদী সীমায় উপসম্পদা দিতে ; কিন্তু যে কোন বয়সের ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেন। তাঁরা জানতেন না যে, বিশ বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিলে, সেই ব্যক্তি ভিক্ষু হয় না; অভিক্ষু থেকে যায়। সেই অভিক্ষু গণপূরক ভিক্ষুরা যদি বিশ বৎসর বয়স্ক

ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করেন, তথাপি সেই ব্যক্তি অনুসম্পন্ন বা অভিক্ষু থেকে যায়। সেই অভিক্ষু পরম্পরা ভিক্ষুরা যদি বিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকেও উপসম্পদা প্রদান করেন, তারাও অভিক্ষু রয়ে যায়। এভাবে অন্ধবেণী পরম্পরা সকলেই অভিক্ষু রয়ে গেল, বিনয় সম্মত ভিক্ষু কোথায়? "ভোবাদি নাম সো ভিক্ষু"।

মহামান্য সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির রাজানগরে ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় সংঘরাজ নিকায়ের পরিচালন ভার তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য আচার্য চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরের উপর ন্যস্ত করে স্বদেশ আরাকানে চলে যান। এদিকে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আচার্য চন্দ্রমোহনের পিতৃ বিয়োগ ঘটে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে স্থানীয় ভিক্ষু সংঘের পরিচালনভার তারই সুযোগ্য সহকর্মী জ্ঞানালংকার মহাস্থবিরের উপর অর্পণ করে তিনি ব্রহ্মদেশে চলে যান। তথায় চারি বৎসরকাল অবস্থান করে শ্রীলংকা গমন করেন এবং তথাকার রামায় নিকায়ের বিজয়ানন্দ বিহারে অবস্থান করেন। এদিকে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির যখন পরলোক গমন করেন, তখন জ্ঞানালংকার মহাস্থবির আচার্য চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে স্বনিকায়ের পরিচালনভার গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি সুদীর্ঘ বার বৎসর বিদেশে অবস্থানের পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে উনাইনপুরাতেই অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মন্দির নির্মাণ করে বুদ্ধের পদচিহ্ন স্থাপন করেন। উক্ত মন্দির উৎসর্গ উপলক্ষে **সংঘরাজ নিকায়ের** সমস্ত ভিক্ষুসংঘকে আহবান করে বিরাট এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে পুন্নাচার ধর্মধারী আচার্য চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরকে **"সংঘরাজ"** পদে অভিষিক্ত করেন। অতঃপর চট্টগ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একের পর এক স্থবির মহাস্থবিরগণ স্বশিষ্য পূর্ব শিক্ষাপদ ত্যাগ করে পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ করে সংঘরাজ নিকায়ে যোগদান করেন। তন্মধ্যে মুখ্যরূপে আচার্যের পিতৃব্য তদানীন্তন ভিক্ষু নেতা উনাইনপুরার সুধন মাথে, বেলখাইনের মধু মাথে, জোয়ারার বেপারী মাথে, দেওয়ানজি পাড়ার পহরচাঁন মাথে, বাঁশখালীর জয়গোপাল মাথে, কড়ৈয়ানগরের মহারাজ মাথে, রাউজানের পরাণ ঠাকুর, বিনাজুরীর দেবু মাথে ও হরি মাথে, গহিরার নব মাথে ও রামমনি মাথে, আবদুল্লাপুরের হরি মাথে, ধর্মপুরের বজুমাথে, গুমানমর্দনের অমর সিংহ ও দুরাজ মাথে, হাইদচকিয়ার নৈচাঁন মাথে, ভূজপুরের গোলক মাথে, দমদমার গুরুদাস মাথে, রাঙ্গুনীয়ার নবীন মাথে প্রভৃতি স্থবির মহাস্থবিরগণ পূর্ব শিক্ষাপদ ত্যাগ করে পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ করে পরিশুদ্ধ সংঘরাজ নিকার ভুক্ত হন।

১। উদ্ধৃত সাম্য বিশেষ সংখ্যা-১৯৮১।১-বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মে মহাস্থবিরদের অবদান, পৃঃ ১। ২-বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মে মহাস্থবিরদের অবদান, পৃঃ... ৩-বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মে মহাস্থবিরদের অবদান, পৃঃ ৪৭।

সুতরাং দেখা যায় কয়েকজন স্থবির মহাস্থবির ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সকলেই পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ করে পরিশুদ্ধ সংঘরাজ নিকায়ে যোগদান করেন। অতএব বাংলাদেশের শতকরা পঁচানব্বই জন বৌদ্ধ এখন সংঘরাজ নিকায়ের অন্তর্ভূক্ত।

বর্তমান মহাস্থবির নিকায় বা মাথের দলের অবস্থিতি নিম্নরূপঃ- রাউজান থানার আবুরখীল, হোয়ারা পাড়া, নয়া পাড়া, জয়নগর ও পাঁচখাইনের সমস্ত এবং আধারমানিক, পাহাড়তলী ও বাগোয়ানের কিয়দংশ। হাটহাজারী থানার মাদার্শা। রাঙ্গুনীয়া থানার পশ্চিম সৈয়দবাড়ীর ২০/২২ ঘর, শীলক, পদুয়া ও সুখবিলাসের কিছু অংশ। বোয়ালখালী থানার চরণদ্বীপ, খরণদ্বীপ সম্পূর্ণ এবং জ্যৈষ্ঠপুরা, শ্রীপুর ও শাকপুরার কিছু অংশ। পটিয়া থানার লাখেরা ও পিঙ্গলার সমস্ত এবং বাথুয়া ঠেগরপুনি, পাঁচরিয়া, কর্তালা ও বেলখাইনের কিয়দংশ। আনোয়ারা থানার চাড়ালা ও কেঁয়াগর, এছাড়া চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের কোথাও মহাস্থবির নিকায়ের বা মাথের দলের কোন অস্তিত্ব নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা, মাং ও বোমাং সার্কেলের কোথাও তাদের অনুসারী নেই। এছাড়া, নীলা, টেকনাফ, রামু, কক্সবাজার, মহেশখালী, হারভাং, পটুয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলের যে সমস্ত মারমা, রাখ্যাং বাস করেন তাঁরা সকলেই সংঘরাজ নিকায়ভূক্ত। এ সম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট ও দূরীকরণের জন্য মহাস্থবির নিকায়ের প্রবীন নেতা প্রখ্যাত সাংবাদিক বাবু বিশ্বেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের বক্তব্যের কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ- "এই ভাবে চট্টগ্রাম তথা বাংলার বৌদ্ধ সমাজের সর্ববৃহৎ অংশ ব্রহ্ম, সিংহল, শ্যাম, তথা থেরবাদী বৌদ্ধ বিশ্বের সাথে পরিচিত ও সংযুক্ত হয়। কিছু সংখ্যক প্রাচীন পন্থী রাউলী মাথে, গোড়া পন্থী দায়কদের সমর্থনে মর্যাদাহানীর ভয়ে সংঘরাজ সারমেধের নিকট থেরবাদী উপসম্পদা গ্রহণে অসম্মত থেকে যায়। তাঁরাই চট্টগ্রামে বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে "মাথে দল" নামে পরিচিত। এই মাথের দলের **"দাসুরাম মাথে" ও "তিতন মাথে"** সমধিক প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি চট্টগ্রাম জেলার ১৪টি থানার মধ্যে মূখ্যত রাউজান থানা এবং রাঙ্গুনীয়া, বোয়ালখালী ও পটিয়া থানার কয়েকটি ক্ষুদ্র পাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা, বোমাং ও মাং এলাকায় তাঁদের কোন অনুসারী ও প্রভাবাধীন লোক নাই। তাঁরা সকলেই সংঘরাজ নিকায়ভূক্ত।

এই মাথের দলের মোট ভিক্ষু সংখ্যা ২০/২৫ জনের বেশী নয়। এদের মধ্যেও দাসুরাম মাথের দল ও তিতন মাথের দলের মধ্যে পার্থক্য ছিল। সম্প্রতি দাসুরাম মাথের কিছু সংখ্যক ভিক্ষু তিতন মাথের দলে এবং অবশিষ্ট সংঘরাজ দলে যোগদান করেন। সারা বাংলাদেশে সংঘরাজ ও মাথের দল, এই দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এরা দুই দলে এক সংগে পংক্তি ভোজন অর্থাৎ আহার্য গ্রহণ করেন না, ধর্মকর্ম কোন বিষয়েই সহযোগিতা চলে না। সংঘরাজ দলের নিকট মাথের দল অভিক্ষু অর্থাৎ বিনয় সম্মতভাবে উপসম্পন্ন

নয় হেতু বর্জিত ভিক্ষু দল। সিংহল, ব্রহ্ম, থাইল্যান্ড ইত্যাদি বৌদ্ধদেশেও সংঘরাজ দল বৌদ্ধ ভিক্ষু সমাজ ভূক্ত এবং মাথের দল অপাংক্তেয়। আলোচ্য দেশে গিয়ে পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ না করলে তাঁদের কোন বৌদ্ধ বিহারে স্থান দেওয়া হয় না।"[১]

এর পরও যদি বলা হয়-"এই থেরো বা মহাথেরো সমন্বয়ে গঠিত মহাস্থবির নিকায় বা মাথের দল শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়, সমগ্র উপমহাদেশে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে ভিক্ষুদের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিপুল অবদান যুগিয়ে আসছে এবং সে ধারা এখনও অব্যাহত রেখে চলেছে।"[১] আরও বলা হয়েছে "মহাস্থবির নিকায় নামে খ্যাত ভিক্ষুসংঘ শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে সগৌরবে আজ প্রতিষ্ঠিত।"[১] এর উপর টীকা-টিপ্পনী নিরর্থক। পণ্ডিত গ্রন্থকার দ্বয় আরও লিখেছেন-"বরিশালে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের অধিকাংশ বৌদ্ধদের বাস। তারা কেউ কিন্তু সংঘরাজ নিকায়ভূক্ত নয়। পক্ষান্তরে চট্টগ্রামে যে বড়ুয়া বৌদ্ধদের বাস তাতে মহাস্থবির নিকায় ও সংঘরাজ নিকায় নামে ভিক্ষুদের দুইটি নিকায় বর্তমান। এই দুইটি নিকায়ের মধ্যে প্রায় অর্ধেক মহাস্থবির নিকায়ের অন্তর্ভূক্ত, অপর অংশ সংঘরাজ নিকায়।"[১] এত বড় ডাহামিথ্যা কথা ছাপার অক্ষরে প্রচার করার দুঃসাহস সত্যই আশ্চর্য জনক। এই সম্বন্ধে বাবু বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর উপরি উক্ত উদ্ধৃতি অনুধাবন যোগ্য। মহাস্থবির নিকায় বা মাথের দল চট্টগ্রাম জেলার ১৪টি থানার মধ্যে মুখ্যত রাউজান থানা এবং রাঙ্গুনীয়া, বোয়ালখালী ও পটিয়া থানার কয়েকটি ক্ষুদ্র পাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের উপরও এসে যায় ঘোর দুর্দিন। এর দু'একটি উদাহরণ দিয়েই আমার বক্তব্যের উপসংহার করব। এক সময়ে ব্রহ্মদেশে ধর্মের উপর ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হয়েছিল, ধর্মের নামে অধর্মের ধ্বজা উড়েছিল, ভিক্ষুসংঘেরা ধর্ম-বিনয় ভুলে বলেছিলেন, সর্বত্র এক অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক সেই ঘোর দুর্দিনে শ্রীলংকা হতে ভিক্ষু সংঘ এনে ব্রহ্মদেশের ভিক্ষু সংঘকে পুনঃ উপসম্পদা প্রদান করে পরিশুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তদ্রূপ শ্রীলংকায়ও একবার বৌদ্ধধর্মের উপর ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হয়েছিল, তখন থাইল্যান্ড হতে ভিক্ষুসংঘ এনে শ্রীলংকার ভিক্ষুসংঘকে পুনঃ উপসম্পদা দান করে পরিশুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে থাইল্যান্ডের রাজপুত্র শ্রদ্ধেয় বরজ্ঞান স্থবির ব্রহ্মদেশ হতে ভিক্ষুসংঘ আনয়ন করে স্বদেশে **"ধর্ম যুক্তিক"** নিকায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এভাবের নানা ঘাত প্রতিঘাতের কবলে পড়ে আমাদের পূর্বসূরি ভিক্ষুরা কি অসুবিধায় পড়েছিলেন তা আমরা ভারত-বাংলা উপমহাদেশের বৌদ্ধধর্মের উত্থান পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজে অনুমান করতে পারি। আমাদের এমন এক দুঃসময় এসে উপস্থিত

হয়েছিল, বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে আমরা আমাদের পূর্ব শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ধর্মকর্ম সব ভুলে গিয়েছিলাম। যেই ভারতীয় উপমহাদেশের বৌদ্ধভিক্ষুরা একদিন নালন্দা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করেছিলেন, যাঁদের চিন্তা প্রসূত জ্ঞানবিজ্ঞানে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার এখনও পরিপূর্ণ, তাঁদের উত্তরসূরি বাংলার তথাকথিত ভিক্ষুদের কাছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটি ধর্মীয় গ্রন্থ অবশিষ্ট ছিল না। এ সত্যই আশ্চর্য, আশ্চর্য হলেও সত্য।

কথিত আছে, মগধ ও বিহার হতে রাষ্ট্র বিপ্লব ও ধর্ম বিপ্লবের বিতারিত বৌদ্ধেরা সদ্ধর্মের নিরাপত্তা ও জীবনের নিরাপত্তার জন্যে আত্মগোপন করে দলে দলে বঙ্গের উত্তর-পূর্ব আসাম হয়ে এই চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন, অপর অংশ আরাকান হয়ে চট্টগ্রাম এসেছিলেন। সুতরাং তাঁদের কাছে ধর্ম বই থাকা সম্ভবও ছিলনা, আত্মরক্ষা করেছে এটাই যথেষ্ট। এই দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, আমাদের পূর্বসূরিরা সকলেই ছিলেন হৃত সর্বস্ব ছিন্নমূল, নামে মাত্র বৌদ্ধ। তাই আমাদেরকে বিদেশীদের স্মরণ নিতে হয়েছিল, এটা লজ্জার কথা নয় ; কিন্তু শাকদিয়ে মাছ ঢাকতে যাওয়াটাই নিন্দনীয়। তবে এই কথা স্বীকার্য যে, প্রাচীন মহাস্থবিরেরা এদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদে যে কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তাঁদের ঋণ আমরা অকপটে স্বীকার করি। তাই বলে যে, তাঁদের তান্ত্রিকতা আমাদিগকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকতে হবে, এর কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ দেখি না।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজবংশের অভ্যুদয়ের সংগে সংগে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের যে প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না ; কিন্তু মহাযান অধ্যুষিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম-তন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতির আগমনে বৌদ্ধধর্ম এক বিকট রূপ ধারণ করেছিল। তার পর পাল উপসন্ধ্যায় সেন বংশের আগমনে বাংলার বৌদ্ধধর্মের উপর ঘোর অরাজকতার তাণ্ডব চলেছিল। সেই অন্ধকারময় যুগের তমঃ নিশায় আরাকান, ত্রিপুরা, চাকমা, পর্তুগীজ প্রভৃতির দ্বারা বাংলার উপর অরাজকতার যে আঁধি চলেছিল তারও কিছু আভাস পূর্বে দিয়েছি। তার পরের শত বৎসরের মুসলিম শাসনামলে আমাদের মধ্যে শেষ সম্বলরূপে যে দু'একটি পুঁথিপত্র ছিল, তাও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তখন আমাদের কাছে আর ছিল না ধর্মীয় গ্রন্থ-পুঁথিপত্র; সুতরাং আমরা ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের ধর্ম-বিনয়, বৌদ্ধ রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, এমন কি আমরা জানতাম না যে উপসম্পদার বয়স, উপসম্পদা দানের বিধিবিধান, তাই উপসম্পদা দানের পর উপসম্পন্ন ভিক্ষুকে বিহারে এনে দশশীল দিতাম। সেই মহাদুর্দিনে, ঘোর অন্ধকারময় যুগে পার্শ্ববর্তী আরাকানের ভিক্ষু সংঘেরাই ছিল আমাদের পরম মিত্র, একমাত্র সহায় সম্বল, তাঁরাই এসে আমাদের পার্শ্বে দাঁড়ালেন, আমাদের ভুল ধরে দিলেন, শাসন বিশুদ্ধির প্রস্তাব দিলেন, বুদ্ধ নির্দেশিত বিনয় বিধান মতে ব্রহ্ম,

সিংহল ও থাইল্যাণ্ডের অনুকরণে এদেশেও পুনঃ উপসম্পদা প্রদান করে প্রকৃত থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন। এতে অগৌরবের কি আছে? অধিকন্তু মহামান্য সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির প্রমুখ ভিক্ষুরা, যাঁরা বহু আয়াস স্বীকার করে আমাদের চট্টগ্রামের তথাকথিত তান্ত্রিক ভিক্ষুদিগকে পুনঃ থেরবাদ বিনয় সম্মত উপসম্পদা দানে পরিশুদ্ধ ভিক্ষু সংঘের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে শাসন সমাজের যে প্রভূত উপকার সাধন করেছিলেন ; তাঁরা থাকবেন আমাদের কাছে চির স্মরণীয়, বরণীয় ও পূজনীয়। কিন্তু আমাদের পরম ও চরম দুর্ভাগ্য এই যে, কতিপয় প্রাচীন পন্থী তথা সংস্কার বিরোধী স্থবির, মহাস্থবির তাঁরা সেই অন্ধকারময় মধ্যযোগীয় কতকগুলি ধর্মবিনয় বিরোধী ও সংস্কার বিরোধী আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি আকড়ে ধরে থাকায় আজ আমাদের বৌদ্ধ সমাজের এই দুর্দশা ও দুর্ভোগ। চিন্তাশীল জাগ্রত বৌদ্ধ সমাজের কাছে আমার আবেদন, আপনারা প্রকৃত বৌদ্ধ হিসেবে উদার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগি দিয়ে জ্ঞানরূপ কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখবেন সত্য কোথায় নিহিত।

বুদ্ধের ভাষায় ঃ-

"ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পুরিসাধমে,
ভজেথ মিত্তে কল্যাণে ভজেথ পুরিসোত্তমে।"-ধর্মপদ

"পাপমিত্রের সংসর্গ করিবেনা; নরাধম ব্যক্তির সংসর্গ করিবেনা, কল্যাণমিত্রদের ও পুরুষোত্তমদের সংসর্গ করিবে।"

পরিশিষ্ট

আমি শ্রামণের অবস্থায় পর্যন্ত দেখে আসতেছি যে, কতিপয় ভিক্ষু-গৃহী "নিকায়" বা "দল" মিলনের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রয়াত উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দী (উকিল) ছিলেন অন্যতম। ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির, শ্রীমৎ শান্তপদ মহাস্থবির, শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাস্থবির, শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু প্রমুখ স্থবির, মহাস্থবির ছিলেন প্রধান। এই বিষয় নিয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ লেখা-লেখি ও সভা-সমিতির মাধ্যমে বহু আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে সংঘরাজ নিকায়ের মহামান্য সংঘরাজ শ্রীমৎ অভয়তিষ্য মহাস্থবির ও বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির এবং কতিপয় বিশিষ্ট ভিক্ষু কর্তৃক চুক্তি নামায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তারই মূলকপি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হলো।

"অদ্য ২৭।১।৬৬ ইং বৃহস্পতিবার সাতবাড়িয়া শান্তি বিহার চট্টগ্রাম। সংঘনায়ক (সংঘরাজ নিকায়ের মহামান্য সংঘরাজ) শ্রীমৎ অভয়তিষ্য মহাস্থবির ও শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির মহোদয়ের উপস্থিতিতে যুক্ত বৈঠকে পাকিস্তান বৌদ্ধ শাসনের ও সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ মানসে বর্তমান সংঘরাজ নিকায় ও মহাস্থবির নিকায়দ্বয়ের মিলনার্থে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ উভয় নিকায়ের কারক সভায় আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাব্যস্ত হইল ঃ-

(১) শ্রীমৎ সংঘনায়ক অভয়তিষ্য মহাস্থবিরের প্রস্তাবঃ-

কর্মবাক্য পাঠের মাধ্যমে উভয় নিকায়ের মিলন সম্পাদিত হউক এবং সংঘরাজ নিকায় হইতে নির্বাচিত ভিক্ষুগণ কর্তৃক কর্মবাক্য পাঠ করা হউক।

(২) পাকিস্তান কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের প্রস্তাবঃ-

বিগত সংগায়নে উভয় নিকায়ের যে সমস্ত ভিক্ষু বিনয়কর্মে অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের দ্বারা কর্মবাক্য পাঠ করা হউক অথবা বার্মা হইতে ৫ জন ভিক্ষু আনয়ন করিয়া কর্মবাক্য পাঠ করা হউক।

(৩) এই মিলন সর্বসম্মত উদক সীমায় করা হউক।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
শ্রীমৎ অভয়তিষ্য মহাস্থবির	বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো
শ্রীমৎ সুভূতিরত্ন মহাস্থবির	২৭।১।৬৬ ইং
২৭।১।৬৬ ইং	ভিক্ষু প্রিয়ানন্দ
শ্রীমৎ শান্তপদ মহাস্থবির	২৭।১।৬৬ ইং
শ্রীমৎ ধর্মবিহারী ভিক্ষু	
শ্রীমৎ ধর্মজ্যোতি মহাস্থবির	লিখক-পূর্ণানন্দ ভিক্ষু
শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয় ভিক্ষু	

উপরি উক্ত চুক্তির সত্বমোতাবেক উভয় নিকায়ের কারক সভা আহবান করা হয়। সংঘরাজ নিকায়ের সভা আহবান করা হয়েছিল উনাইনপুরা লঙ্কারাম বিহারে আর মহাস্থবির নিকায়ের সভা আহবান করা হয়েছিল পিঙ্গলা সার্বজনীন বিহারে। সংঘরাজ নিকায়ের কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন সংঘরাজ নিকায় সংখ্যায় অধিক, সুতরাং তাঁদের প্রস্তাবই মহাস্থবির নিকায়ের ভিক্ষুদের গ্রহণ করা উচিৎ। কিন্তু মহাস্থবির নিকায়ের কারক সভা সংঘরাজ নিকায়ের প্রস্তাব স্বীকার করতে রাজি হলেন না। এই সংবাদ সংঘরাজ নিকায়ের কারক সভায় এসে পৌঁছলে প্রথমতঃ কোন কোন ভিক্ষু উষ্মা প্রকাশ করেন। পরে এই বিষয়ের উপর অনেক আলোচনা হয়। পরিশেষে মহাস্থবির নিকায় কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাব দুটির যেকোন একটি স্বীকার করা যায় কিনা, বহু আলোচনার পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মহাস্থবির নিকায় কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাবের দ্বিতীয় ধারা অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ হতে পাঁচজন ভিক্ষু আনিয়া তাঁদের দ্বারা উদক সীমায় কর্মবাক্য পাঠের মাধ্যমে উভয় নিকায়ের ভিক্ষুদের মিলন সাধিত হউক।

পরিতাপের বিষয় এই যে, মহাস্থবির নিকায়ের প্রদত্ত প্রস্তাব (বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের প্রস্তাব) ও মহাস্থবির নিকায়ের কারক সভায় নাকচ করে দেয়। সর্বশেষ প্রয়াত আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির এক নতুন প্রস্তাব করে সংঘরাজ নিকায়ের অনুমতি ক্রমে মহাস্থবির নিকায়ের কারক সভায় অনুমোদনের জন্য পাঠান হলো, কিন্তু তাও মহাস্থবির নিকায়ের কারক সভা স্বীকার করেন নাই। সেই প্রস্তাব হলোঃ- "ব্রহ্মদেশ অথবা শ্রীলঙ্কা হতে পরিশুদ্ধ সংঘরাজ নিকায় অথবা রামায় নিকায় হতে পাঁচজন ভিক্ষু আনয়ন করা হউক এবং তাঁরাই কর্মবাক্য পাঠ করুক। আমরা উভয় নিকায়ের ভিক্ষুরা (অর্থাৎ মহাস্থবির নিকায়ের ভিক্ষুদের সঙ্গে সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুরাও) কর্মবাক্য শ্রবণ করব। তারপর আমরা উভয় নিকায় মিলে এক হব।" এতে সংঘরাজ নিকায়ের কতিপয় ভিক্ষু জোর আপত্তি উত্থাপন করলে শ্রীমৎ জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির আবেগ ভরা কণ্ঠে বলেছিলেনঃ-"আমি আমার এতদিনের ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনঃ ভিক্ষু হব, সবার ছোট হব। তথাপি আসুন আমরা সবাই মিলে যাই।" তাঁর এই আবেগ ভরা কণ্ঠের বাণীতে ছিল ঐন্দ্রজালিক শক্তি। তাই সংঘরাজ নিকায়ের কারক সভা নীরব তাঁর প্রস্তাব সমস্ত ভিক্ষু স্বীকার করে নিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে সেই প্রস্তাব ও মহাস্থবির নিকায়ের কারক সভা বাতিল করে দিল। সুতরাং মিলনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থে পর্যবসিত হলো। হায়! একি নিয়তির পরিহাস, না মানুষের খেয়াল। এখনও দেখছি কেহ কেহ ভদ্রে সভা সমিতিতে মিলনের ভাঁওতা আঁওড়িয়ে লোক ভুলানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু সত্য চিরদিনই সত্য থাকবে, মিথ্যার মুখোশ খুলে যাবে। "সত্যমেব জয়তু।" "সব্বে সত্তা সুখীতা হোন্তু।" "জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।"

পরিশিষ্ট-২

বাংলাদেশের বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজে এই বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য কে বা কারা দায়ী?

বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজে যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন ১৮৬৪ সালে তৎকালীন শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরো মহোদয় বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজে রাউলী পৌরোহিত প্রথা দূরীভূত করে সদ্ধর্মের পুনঃ জাগরণ ঘটান।

তারপর থেকে আমরা শুনে আসছি বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মধ্যে দুই দলে বিভক্তির কথা। সেই সময়ে যে সমস্ত রাউলী পুরোহিতেরা শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরো'র কাছে নতুন করে পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে নিয়ে সৃষ্টি হয় বুদ্ধের থেরবাদ মূলধারার আদর্শিক সংঘরাজ নিকায়। অপর দিকে সেই সকল প্রাচীন রাউলী পুরোহিতেরা তাঁর কাছে নতুন করে উপসম্পদা গ্রহণ করেননি তাঁরাই বর্তমানে মহাস্থবির নিকায় বা মাথের দল।

পুরনো ইতিহাস বলে পাঠকদের ধৈয্য চ্যুতি করতে চাই না, মূল কথায় চলে আসি, আমার মূল কথা হলো বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কে বা কারা দায়ী? হয়ত অনেকেই বলবেন তার জন্য দায়ী সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা। কারণ তাঁরা একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন এতে লিখা আছে, "বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা অথবা মাথের দলের কোন ভিক্ষুর সঙ্গে একসাথে ধর্মীয় ও জাতীয় যে কোন অনুষ্ঠানে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়", বিগত ০৫/০৭/২০১৪ ইং তারিখে বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সাধারন সভায়। যতদিন পর্যন্ত শ্রীমৎ বনশ্রী মহাস্থবির, সংঘরাজ নিকায়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাথেরো মহোদয়কে এবং সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুসংঘকে যে অশোভন কটুক্তি করেছেন তাঁর সেই উক্তি প্রত্যাহার করে সংঘের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করবে ততদিন পর্যন্ত উক্ত সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে। এর আগে সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার পক্ষ হতে শ্রীমৎ বনশ্রী মহাস্থবিরকে অশোভন কটুক্তি গুলো প্রত্যাহার করার জন্য বারবার অনুরোধ করা হলেও তিনি তা প্রত্যাহার করেন নি।

এবার জানা যাক কী অশোভন উক্তি করছে শ্রদ্ধেয় বনশ্রী মহাস্থবির, উমেশ চন্দ্র মুৎমুদ্দির রচিত আমার শেষ বক্তব্য গ্রন্থের পুনঃ মুদ্রণের নিবেদনে লিখেছেন "সংঘরাজ নিকায়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাথেরো মহোদয় (বনশ্রী মহাস্থবিরের ভাষায়) সংঘভেদকারী, বর্জ্জিত, পারজিকা প্রাপ্ত অ-ভিক্ষু এবং তাঁর সৃষ্টি সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুরা সবাই অ-ভিক্ষু। এই উক্তিগুলো শ্রদ্ধেয় বনশ্রী মহাস্থবির দ্বারা লিখিত হয়েছে, প্রিয় পাঠক/পাঠিকাগণ যিনি বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজে ১৮৬৪ সালে রাউলী পৌরোহিত প্রথা দূরীভূত করে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ সৃষ্টি করে সদ্ধর্মের পুনঃ জাগরণ ঘটান সেই শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরো মহোদয় নাকি (বনশ্রী মহাস্থবিরের ভাষায়) সংঘভেদকারী, বর্জ্জিত, পারজিকা প্রাপ্ত অ-ভিক্ষু এবং তাঁর সৃষ্টি সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুরা সবাই অ-ভিক্ষু। আসলে শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরো মহোদয় কী অ-ভিক্ষু ছিলেন? তাঁর সৃষ্ট সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুরা সবাই অ-ভিক্ষু? যদি অ-ভিক্ষু হয়ে থাকেন তাহলে তিনি কীভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে অসামান্য অবদানের জন্য বৃটিশ সরকার থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, চাকমা রানী পূণ্যশীলা কালিন্দী রানী ও ব্রহ্মদেশের সম্রাট ধর্মরাজ মিনডন রাজকীয় এই ত্রি-মুকুট উপাধিতে ভূষিত হলেন? তাদের দৃষ্টিতে তখন স্ব-ঘোষিত তথা কথিত মহান ভিক্ষুরা কোথায় ছিলেন? তারাই বা কেন এই রাজকীয় উপাধিসমূহ লাভ করতে পারেন নি? আসলে তখনকার দিনে

থেরবাদের আদর্শে কোন ভিক্ষুই ছিল না যারা ছিল, তাঁরা ছিলেন হীনযান, মহাযান মিশ্রিত রাউলী পুরোহিত। এই দোষ যুক্ত বাক্য গুলো বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার তৎকালীন সভাপতি শ্রদ্ধেয় বনশ্রী মহাস্থবির কীভাবে বলতে পারলেন? এই ধরণের দোষযুক্ত বাক্যগুলো শুধু গৃহী ভিক্ষু রাউলী পুরোহিত অনুসারীদের দ্বারাই সম্ভব কিন্তু প্রকৃত ভিক্ষু হলে কেউ এই সব কথা বলতে পারেন না। তার জন্য সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার এ বিজ্ঞপ্তি।

অপর দিকে সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার বিজ্ঞপ্তির প্রত্যুত্তর রূপে বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা একটি বিবৃতি প্রচার করেন, এতে লিখা হয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার এ বিজ্ঞপ্তি অন্ধকার ও মানবতা বিরোধী।

এখন আমার প্রশ্ন হল বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা (মাথের দলের কাছে) মানবতা বিরোধী বলতে কি বুঝিয়েছেন? তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নহে, আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে "মানবতা বিরোধী" বলতে বুঝি যে কাজ বা কর্ম মানবতার বিরোধী অর্থাৎ মানবের কল্যাণমুখী নয় যেমন : বর্তমান বাংলাদেশে যারা ১৯৭১ সালের মানবতা বিরুদ্ধের কাজ করেছিল তাদের বিচার হচ্ছে। সংঘরাজ নিকায় কিংবা উক্ত সংগঠনের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কী এই রকম অপরাধের অভিযোগ অতীতে বা বর্তমানে আছে? তাহলে বাংলাদেশ সংঘরাজ মহাসভার বিজ্ঞপ্তিটি মানবতা বিরোধী হল কিভাবে? সাংগঠনিক নির্দেশ আছে যেহেতু রাউলী পুরোহিতেরা নতুন ভাবে উপসম্পদা গ্রহণ করেনি, সেহেতু সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুরা মাথের দলের ভিক্ষুদের সাথে একসঙ্গে খাওয়া, মেলামেশা, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়ার। বর্তমানে সেই পুরোনো ব্যাপার গুলো আবারও কেন আসল? কারণ শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাথেরো মহোদয়কে নিয়ে শ্রদ্ধেয় বনশ্রী মহাস্থবির যে কটুক্তি করেছেন, ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে "অ-ভিক্ষু" নামক কোন শব্দ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নি, একজন বর্ষীয়ান ভিক্ষুর কাছে আমরা এইরূপ কু-বাক্য যা সভ্যতাকে হার মানায় তা ওনার কাছে আশা করিনি। ওনার সেই কথার প্রতিবাদ স্বরূপ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার এ বিজ্ঞপ্তি।

প্রিয় পাঠক গণ এ বিজ্ঞপ্তি যদি মানবতা বিরোধী হয়ে থাকে, তাহলে ১৯৮০ সালে ২১ জুলাই ৮ম সংঘরাজ পরম পূজ্য শীলালংকার মহাথেরো মহোদয় সহ অর্ধশতাধিক ভিক্ষুসংঘ নিয়ে আবুরখীল গ্রামে তালুকদার পাড়ায় এক সংঘদান অনুষ্ঠানে যোগদান করার সময় কেরানীহাট নামক স্থানে মাথের দলের কতিপয় ভিক্ষু এবং কিছু দায়ক মিলে মারমুখী হয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করেন। যার ফলে ভন্তেরা সেদিন দুপুরের আহার পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেন নি। যেহেতু ভন্তেরা দুপুর ১২ টার পূর্বে আহার গ্রহণ করার বিনয় বিধান রয়েছে। বুদ্ধ বলেছেন কাউকে যেন দানে বঞ্চিত করা না হয়, এমন কি তির্য্যক প্রাণীকেও নয়, সে জায়াগায় মহামান্য ৮ম সংঘরাজ শীলালংকার মহাথেরো সহ ভিক্ষুসংঘকে দানে এবং দুপুরের আহার গ্রহণে বাধা দিয়ে তারা কি প্রকৃত মানবতাবাদের কাজ সম্পাদন করেছিল?

আবুরখীল গ্রামে তালুকদার পাড়ায় স্বল্প সংখ্যকদায়ক/দায়িকা নিয়ে একটি সংঘরাজ নিকায়ের বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উক্ত বিহারে ২০১৩ সালে কঠিন চীবর দান করার জন্য সমস্ত আয়োজন পরিপূর্ণ করেও আবুরখীলের কতিপয় মাথের দলের ভিক্ষু এবং কিছু দায়ক মিলে কঠিন চীবর দান করতে দেয় নি। এমনকি সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষু নিয়ে উক্ত বিহারে যদি কঠিন চীবর দান করা হয় তাহলে উক্ত বিহারের সকল দায়ক/দায়িকাদের আবুরখীল গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার হুমকি পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছিল। এই গুলো মানবতা বিরোধী কাজ নয়

কি? কারণ আবুরখীল গ্রামে সংঘরাজ নিকায়ের দায়ক/দায়িকারা হলো সংখ্যালঘু, সে কারণে তারা দূর্বল, (দূর্বলকে সবলে আক্রমণ করবে সেটা স্বাভাবিক।) অপরদিকে বাংলাদেশের কয়েকটি গ্রামে মাথের দলের দায়ক দায়িকারা সংখ্যালঘু সে সমস্ত গ্রামে সংঘরাজ নিকায়ের কোন ভিক্ষু বা দায়ক/দায়িকারা তাদের মতো কোন অনুষ্ঠান পন্ড বা ভিক্ষু সংঘকে আহার করতে না নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলো এমন নজির আছে কি? বরংঞ্চ যে সব স্থানে সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষু এবং দায়ক/দায়িকারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা মাথের দলের ভিক্ষু এবং দায়ক/দায়িকাদের সংখ্যালঘু বলে আক্রমন না করে তাদেরকে সর্বক্ষেত্রে সহায়তা করেছে সে রকম ইতিহাস এখনো আমাদের বৌদ্ধ সমাজে চলমান। কিন্তু সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষু এবং দায়ক/দায়িকারা সবল হয়েও দুর্বলকে আক্রমণ করেনি।

সম্প্রতি "ধর্মগ্রাম বৃহত্তর আবুরখীল এর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনাকারীদের প্রতিহত করুন!" এই শিরোনামে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়, বিজ্ঞপ্তিটি পড়লেই তাদের চরিত্র বুঝা যাবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তির এক স্থানে উল্লেখ আছে "..... গ্রাম পর্যায়ে মেজরিটি লোকের মতামত ছাড়া কোন অনুষ্ঠান গ্রহণযোগ্য হবে না।..." বুদ্ধ বলেছেন : "বিচায দানং দাতাবং" কোন দায়ক যদি বিচারপূর্বক কোন দান কর্ম সম্পাদন করতে চায় এবং তা যদি মেজরিটি গ্রামবাসীর কর্তৃক মনোনীত না হয় তাহলে সে পুণ্য অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হবে না। এটাই কী ধর্মগ্রামের প্রকৃত রূপ?

আপনারা এদিকে সংঘরাজ নিকায়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাথেরো মহোদয়কে সংঘভেদকারী, বর্জ্জিত, পারজিকা প্রাপ্ত অ-ভিক্ষু তাঁর সৃষ্টি সংঘরাজ নিকায়ের সকল ভিক্ষুরা অ-ভিক্ষু বলে লেখালেখি এবং উক্তি করবেন, তার প্রতিবাদে সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা কোন বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলে সেটা মানবতা বিরোধী প্রতিহিংসামূলক বলে প্রচার করেন। সংঘরাজ নিকায়ের সকল ভিক্ষুরাও তো অ-ভিক্ষু তাঁরা যদি মহাস্থবির নিকায়ের ভিক্ষুদের সাথে একসঙ্গে খাওয়া, একসাথে সূত্রপাঠ, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান না করলে কীভাবে মানবতা বিরোধী হয় আমার তা বোধগম্য নয়। কারণ সংঘরাজ নিকায়ের সকল ভিক্ষুরাও তো অ-ভিক্ষু। সেই অ-ভিক্ষুদের সাথে একসঙ্গে খাওয়া, একসাথে সূত্রপাঠ, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করার এতো ইচ্ছা পোষণ করার নেপথ্যে রহস্য কী? আপনারা কেন বারবার সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুদের সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করার প্রচেষ্ঠা করেন। আপনাদের দূর্বলতা কোথায়! সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুরা তো আপনাদের সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করার এতো ইচ্ছা পোষণ করেন না। ব্যক্তি বিশেষ কতিপয় ভিক্ষু ইচ্ছা পোষণ করলেও তা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলেছেন "এই দেশে বৌদ্ধ ধর্ম পুনঃ জাগরণের প্রাক্কালে..... 'বিনয় জানিতেন না' বর্ণিত বিষয়টি অসত্য, সেই সময়ের (ভিক্ষু) নামধারী রাউলী পৌরোহিত এরা বিনয় জানত কিনা সেটা ইতিহাসে বলে দেবে। আমি আপনি যতই বলাবলি করি না কেন সেটা কখনো সঠিক হবে না। শুধু শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করবো। সুতরাং আমি বলবো শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা না করে সত্যকে সত্য বলুন। তখনি জাতি ও সমাজ উপকৃত হবে।

প্রিয় পাঠক, এখন বিষয়টি বিবেচনার ভার আপনাদের উপর রইল। মানবতা বিরোধী এবং বর্তমান সমাজে বিভক্তি সৃষ্টির জন্য কে বা কারা এবং কোন সংগঠন দায়ী। সকলের শুভ বুদ্ধি উদয় হোক। জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।

লেখক : **সুমনোপ্রিয় থেরো**, অধ্যক্ষ, পশ্চিম গহিরা শান্তিময় বিহার, রাউজান, চট্টগ্রাম।

সম-সাময়িক

আমি গৃহী থাকা কালীন পিতা/মাতার মুখে শুনেছি আমাদের বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে দুইটি দল আছে। একটা হলো সংঘরাজ নিকায়ের দল, অপরটি হলো মাথের দল। জিজ্ঞাসা করলাম তাঁদের মধ্যে দুই দল কেন বা পার্থক্য কি? উত্তর পেলাম তাঁদের মধ্যে যাঁরা রাত্রের বেলা আহার গ্রহন করতো তাঁদেরকে মাথের দল বলা হয়। অপরদিকে যাঁরা রাত্রে আহার গ্রহন করতো না তাঁদেরকে সংঘরাজ নিকায় বলা হয়। যখন প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হলাম তখন ধীরে ধীরে আরো গভীর ভাবে জানতে পারলাম সংঘরাজ নিকায় এবং মহাস্থবির নিকায়ে বা মাথের দলের মধ্যে পার্থক্য কি? ইতিহাস পাঠ করে জানতে পারলাম এবং ইতিহাস স্বাক্ষ্যও দেয়, বৌদ্ধরা এদেশের আদি -অধিবাসী। কালের ইতিহাসে বঙ্গীয় বৌদ্ধভূমিতে এ সত্যটাও যখন মুছে যাচ্ছিল এবং বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজে বিনয় বর্হিভূত বহু কুসংস্কার প্রথা প্রচলিত ছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কক্সবাজার চকরিয়ার হারবাং এর শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির (১৮০১-১৮৮২) আরাকান প্রদেশ হতে বৌদ্ধধর্ম ও বিনয় শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে এদেশে বিনয় সম্মত নুতন উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই নতুন উপসম্পদা ভিক্ষু সংঘের নাম হয় সংঘরাজ নিকায়। তখন ব্রিটিশ শাসনামলে বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় আবার নতুন করে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু কিছু রাউলী পুরোহিত প্রভাব প্রতিপত্তি ও বর্ষাবাস অক্ষুন্ন রাখার জন্য নতুন উপসম্পদা গ্রহণ করেননি, সেই সকল রাউলী পুরোহিতদের নাম হয় মহাস্থবির নিকায় (মাথের দল)। যেটা এই গ্রন্থ পাঠ করলে জানা যাবে।

বর্তমানে যাঁরা মিলনে চেষ্টা করতেছেন আমরা সেই রকম মিলনের কথা বলতে শুনেছি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ও কৃষ্টিপ্রচারে কতিপয় নেতা এবং মহাস্থবির নিকায়ের কতিপয় ভিক্ষুর মুখে, তাও বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ কার্যতে কোন তৎপরতা দেখি না, শুধু সমাজকে দেখাতে চায় আমরা তাদের সাথে মিলতে রাজি। বিশেষ করে দেখা যায় কৃষ্টিপ্রচার ও বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা যে কোনো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত হলে সে অনুষ্ঠানকে সম্মুখে রেখে নিকায়ের মিলনের তৎপরতা চালায়, তাদের বৃহত্তর স্বার্থে সিদ্ধির প্রয়াসে। তখন সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাদের সাথে মিলনের প্রচেষ্টা চালায়। যখন সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুরা অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে তাদের আয়োজিত অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় উক্ত অনুষ্ঠান শেষে তাদের মধ্যে মিলনের আর কোন আগ্রহ বা কার্যক্রম দেখা যায় না, এই হলো তাদের চরিত্র। আসলে তারা আমাদের সাথে আন্তরিক ভাবে মিলনের আগ্রহী নয়, শুধু বহিঃবিশ্বে আমরা সবাই এক, এটা দেখানোর জন্য বারবার তাদের এই ছলচাতুরী।

উদাহরণ স্বরূপ বিগত ১৯/২/২০১৫ইং চট্টগ্রাম শহরস্থ চাঁন্দগাও সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার উভয় নিকায় মিলন প্রসঙ্গে যৌথ সভা হয়, সভায় যে আলাপ আলোচনা হয় তার প্রেক্ষিতে চট্টলার কৃর্তি গৌরব সন্তান, কর্মযোগী প্রয়াত শ্রদ্ধেয় কৃপনশরণ মহাথেরো'র স্বার্ধশত জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে কৃষ্টিপ্রচার ও মহাস্থবির নিকায়ের যৌথ আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংঘরাজ সহ অন্যান ভিক্ষু সংঘকে নিয়ে ঢাকা ধর্মরাজিক বিহারে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানায়। তাদের প্রার্থনা অনুসারে শুধু সংঘরাজকে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা থেকে সম্মতি প্রদান করা হয়। আরো আলোচন হয় যৌথ ঘোষণা পত্রের আলোকে প্রয়াত সংঘনায়ক শ্রদ্ধেয় এস ধর্মপাল মহাস্থবিরের জাতীয় অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়ায় যোগদান করা না করার বিষয়ে আলোচনা হয়, সিদ্ধান্ত হয় যে যৌথ ঘোষণা পত্রে যে সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে উক্ত সিদ্ধান্ত যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে প্রয়াত সংঘনায়ক শ্রদ্ধেয় এস ধর্মপাল মহাস্থবিরের অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সিদ্ধান্ত নেবে। যৌথ সভার সার সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হল-

বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা ও বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার যৌথ ঘোষণা পত্র

১। বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা ও বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার ভিক্ষুরা অতীতে এবং বর্তমানে যেমন- উপ- সংঘনায়ক ভদন্ত বনশ্রী মহাথের, ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের এবং ভদন্ত ডঃ জিনবোধি মহাথের প্রমূখ, একে অন্যের বিরুদ্ধে (নিকায়/ভিক্ষুর) জ্ঞাতে/অজ্ঞাতে, লিখিতভাবে/মৌখিকভাবে, যদি কোন প্রকারের অন্যায় বা অসৌজন্যমূলক আচরণ করে থাকেন, তৎজন্য সাংগঠনিকভাবে/ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের লিখিত প্রকাশনা মধ্যে অভিযুক্ত/বিতর্কিত অংশগুলো স্বজ্ঞানে প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জনানো হউক এবং উপরোক্ত বিষয়ে প্রকাশিত উভয় নিকায়ের বিজ্ঞপ্তিসমূহ প্রত্যাহার করা হউক।

২। অদ্য ১৯/০২/২০১৫ ইংজেরী, ২৫৫৮ বুদ্ধাব্দ তারিখ হতে আমরা একে অন্যের (মহাস্থবির নিকায় ও সংঘরাজ নিকায়) এর অন্তর্ভূক্ত ভিক্ষুগণ স্বজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাবব্দ হচ্ছি যে (সংগঠনের পক্ষে এবং ব্যক্তিগতভাবে) আমরা আর কোনদিন একে অন্যের বিরুদ্ধে আপত্তিকর বা অশোভনজনক কোন আচরণ এবং ভূল বুঝাবুঝি এবং দূরত্ব সৃষ্টি হয় মত কোন লেখা এবং আলোচনা-সমালোচনা হতে বিরত থাকবো। উভয় নিকায়ের গৃহীদেরকে ও বর্ণিত বিষয়ে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ভিক্ষুদের অনুরূপ কার্যক্রম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হউক। যদি কেহ উপরোক্ত বিষয়ে অমান্য করেন তিনি বা তাঁরা অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে দেশীয়

আইনে/সাংগঠনিক বিধানে দণ্ড প্রাপ্ত হবেন- এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক।

৩। কোন গৃহী/সংগঠন, যে কোন কারণে যদি নিকায় পরিবর্তন করতে আগ্রহী হয়, তাঁর/তাঁদের আগ্রহের বিষয়ে উভয় নিকায়ের মহাসভায় বা বলিষ্ঠ ভিক্ষু/গৃহীদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক।

৪। বিনয় সম্পর্কিত কাজ ব্যতিরেখে উভয় নিকায়ের ধর্মীয় ও জাতীয় সকল অনুষ্ঠান সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হউক।

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বৃহত্তর কল্যাণে বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার পক্ষে বাদী চন্দনাইশ থানার জোয়ারা গ্রামে অবস্থানরত অধ্যাপক জ্ঞানরত্ন মহাথের এবং বিবাদী চান্দগাঁও সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের এর "চট্টগ্রাম আদালতে বিচারাধীন" মামলাটি দ্রুত প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

ঘোষণা পত্র-২

বৌদ্ধ সমাজের কল্যাণকামী সাঙ্ঘিক ব্যক্তিবৃগন

বাংলাদেশ সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা

১। ভদন্ত শাসনপ্রিয় মহাথের
২। ভদন্ত বুদ্ধ রক্ষিত মহাথের
৩। ভদন্ত বসুমিত্র মহাথের
৪। ভদন্ত জিনালংকার মহাথের
৫। ভদন্ত সুমঙ্গল মহাথের
৬। ভদন্ত শাসনানন্দ মহাথের
৭। ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথের
৮। ভদন্ত সুগত প্রিয় মহাথের
৯। ভদন্ত শাসনবংশ মহাথের
১০। ভদন্ত মৈত্রীপ্রিয় মহাথের
১১। ভদন্ত শীলানন্দ মহাথের
১২। ভদন্ত সুনন্দ থের
১৩। ভদন্ত সাধনানন্দ মহাথের
১৪। ভদন্ত লোকজিৎ থের
১৫। ভদন্ত জিন রতন থের

বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা

১। ভদন্ত বোধিমিত্র মহাথের সম্পাদক
২। ভদন্ত সুনন্দ মহাথের
৩। ভদন্ত শীলভদ্র মহাথের
৪। ভদন্ত জ্ঞানানন্দ মহাথের
৫। ভদন্ত অভয়ানন্দ মহাথের
৬। ভদন্ত সুভিতানন্দ মহাথের
৭। ভদন্ত পরমানন্দ মহাথের
৮। ভদন্ত উপানন্দ মহাথের
৯। ভদন্ত সুমেধানন্দ মহাথের
১০। ভদন্ত সংঘবোধি মহাথের
১১। ভদন্ত বোধিপ্রিয় থের
১২। ভদন্ত পরমানন্দ থের
১৩। ভদন্ত সুমিত্তানন্দ থের
১৪। ভদন্ত জ্ঞানবংশ থের

সমন্বয়কারী

ডঃ জ্ঞান রত্ন মহাথেরো
ডঃ সংঘপ্রিয় মহাথেরো
ভদন্ত সুমেধানন্দ মহাথেরো
ডঃ প্রিয়দর্শী মহাথেরো

আজিকে হয়েছে মিলন শান্তি ভিক্ষু জীবনের যত ভুল ভ্রান্তি,
সব গেছে চুকে।
যত কিছু ভাল মন্দ, যতকিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আর কিছু নাই
আশায় বুক বেধেঁ ছিলাম হইবে মিলন শান্তি
কিন্তু কি হইতে কি হইল হলো না আর মিলন শান্তি।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে ঘোষণা পত্র, ঘোষণা পত্রই রয়ে গেল কার্যতে কোন কিছুই হলো না। মূলত তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংঘরাজ ও সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুদের অংশগ্রহণ করানোর একটা প্রচেষ্টা কিন্তু মহা মিলনের কোন প্রচেষ্টা নয়। আরো দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে সেখানে সংঘরাজ নিকায়ের কতিপয় ভিক্ষু তাদের তোষোমদকারী হিসেবে কাজ করে সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভাকে সাংগঠনিক ভাবে দুর্বল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। যারা মহামান্য সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরোকে সংঘভেদকারী, বর্জ্জিত, পরাজিকা প্রাপ্ত, অ-ভিক্ষু এবং তার সৃষ্ট সংঘরাজ নিকায় সকল ভিক্ষু অ-ভিক্ষু বলে ঘোষণা দেয় তাদের দৃষ্টিতে এবং অ-ভিক্ষুদের সাথে মিলনের তথাকথিত মহান ভিক্ষুদের এতো আগ্রহ কেন? আর সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুরাই বা কেন নিজস্ব স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে স্বঘোষিত এই মহান ভিক্ষুদের সাথে সন্ধি করবে। অনেকে বলেন পুরানো রাউলী পুরোহিতেরা ছিলেন ভাইরাস আক্রান্ত, তাদের ধারাবাহিকতায় গঠিত হয়েছে মাথের দল, মিলন হলেই ঐ ভাইরাস সুস্থ ব্যক্তির কাছে সংক্রমণ হবে না এমন নিশ্চয়তা কে দেবে। মিলনের প্রশ্নে মহাস্থবির নিকায়ের প্রতিনিধিত্বকারীরা বারবার মিলনের শর্ত বা চুক্তি ভঙ্গ করে পরবর্তীতে নতুন শর্ত আরোপ করে। মিলনের জন্য ১৯/০২/২০১৫ সালের যৌথ ঘোষণা পত্রে উভয় স্বাক্ষর সংবলিত প্রচার পত্র বিলিকরা হয় পরবর্তীতে মহাস্থবির নিকায় তা থেকে সরে গিয়ে আবার নতুন শর্ত আরোপ করে। সচেতন বৌদ্ধ নাগরিকবৃন্দের বোধগম্য এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানসে। নিম্নে তাদের সেই প্রচারপত্রগুলী দেখলেই তা সাধারণ মানুষের নিকট স্পষ্ট হবে।

Namo Tassa

বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা

Bangladesh Bouddha Bhikkhu Mahasabha

(The Supreme Buddhist Sangha Council of Bangladesh)

Assembly of Mahasthabir Nikaya

(Affiliated with the world Buddhist Sangha Council)

Estd. 1753

Ref :

Date : 20/02/

OBJECTS :

To set up

- A hospital for Monks.
- A Bhikkhu Training Centre.
- A Meditation Centre.
- A Library & Museum.
- A Tripitak Translation & Publication Centre.
- A fund for physically incapable Monks & Novices.
- A Printing Press.
- Arrange scholarships for training and higher education of Monks.
- [redacted]
- [redacted] weapons.

OUR BRANCES :

- **Dharmarajika Bouddha Mahavihar.** Atish Dipankar Sarak, Kamalapur, Dhaka
- **Sudarshan Vihar** Hoarapara, East Guzra, Guzra Noapara, Raozan, Chittagong.
- **Dharmananda Vihar** Middle Shakpura, Boalkhali, Chittagong.
- **Chandagon Sarbajanin Bouddha Vihar** Chandgaon, Chittagong City
- **Pancharia Gandha kuti Vihar** Pancharia, Patiya, Chittagong
- **Nandabangsha Int'l Meditation Centre** Bangalhaliya, Rajsthali Rangamati, CHT.
- **Ananda Vihar** Lagnasar, Barura, Comilla.

বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা ও বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার নেতৃস্থানীয় বৌদ্ধ সমাজের কল্যাণকামী ৩২ জন সাংঘিক ব্যক্তিত্ব গত ১৯.০২.২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখ যে সমঝোতায় উপনীত হয় সে ঘোষণাপত্রের আলোকে অদ্য ২৫.০২.২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার কার্যকরী কমিটির জরুরী সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

১. বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার বিরুদ্ধে সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার ভিক্ষুরা অতীতে (ক. ধর্মাধার মহাস্থবির, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, গ্রন্থমালা-২৬, সদ্ধর্মের পুনরুত্থান, সাসনবংশ, খ. বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম-ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী ২১ জুলাই ১৯৮৬ খ্রি.,) এবং বর্তমানে ক. প্রজ্ঞানবংশ মহাথের-প্রজ্ঞা, রাঙ্গামাটি বুদ্ধাঙ্কুর বিহার- ১০ অক্টোবর, ২০০৩খ্রি., বুদ্ধের জীবন ও ধর্ম ইতিহাস ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা, ১৬ সেপ্টেম্বর-২০০৮, প্রজ্ঞা স্মরণিকা-মহানন্দ [redacted] খ্রি. খ. ড. জিনবোধি ভিক্ষু-অর্ঘ্য, সুবোধবিজয় স্মরক- ১০.১১.২০০০, ঙ: কউইথ স্মরক, বৌতবুনিয়া-২৯.০১.২০০৯ খ্রি. প্রজ্ঞা, মহানন্দ সংঘরাজ বিহার, ১৭ মার্চ ২০১০ খ্রি., পারাজিকা-বুদ্ধবংশ ভিক্ষু অবতরণিকা অংশ ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা, ২০০৭খ্রি: ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পুস্তিকায় অশোভন, মানহানি, দূরভূসৃষ্টি, আপত্তিকর লেখালেখি করায় তাঁদের বিতর্কিত অংশগুলো বাংলাদেশ সংঘরাজ মহাসভা প্রত্যাহার করলে বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে, আমাদের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক রনশ্রী মহাথের (বড়ুয়া জাতি ও বাংলাদেশী ভিক্ষুগণের মিলনে আমার শেষ বক্তব্য পুন মুদ্রণ-২৭ মে ২০১০ খ্রি. বইটির) নিবেদন অংশে বিভিন্ন লেখকের উদ্ধৃতি প্রদান করতে গিয়ে বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রথম সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাস্থবির সম্পর্কে এবং ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রীর অশোভন উক্তির প্রত্যুত্তর মহাস্থবির নিকায়ের একেই ধরণের প্রত্যুত্তর হওয়ায় জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা উক্ত লেখার আপত্তিকর অংশ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইতিমধ্যে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা কর্তৃক প্রচারিত বিশেষ জরুরি বিজ্ঞপ্তি ১৯.০২.২০১৫ খ্রি: উভয় নিকায়ের বিজ্ঞ ভিক্ষু সংঘের ঘোষণাপত্রের আলোকে ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে প্রত্যাহার করলে বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভাও প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করলে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২. অদ্য ২৫.০২.২০১৫ খ্রি: তারিখ হতে আমরা বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার বিরুদ্ধে আপত্তিজনক, অশোভন, ভুল বোঝাবোঝি হয় ও দূরত্ব সৃষ্টি হয় এরকম কোন লেখালেখি এবং [redacted]-সমালোচনা হতে বিরত থাকব।

চলমান পাতা-২

Mailing Address : Bangladesh Bouddha Bhikkhu Mahasabha, G. P. O. Box No. - 921, Chittagong-4000, Bangladesh.
Head Office : Nava Pandit Vihar, 15, Kalalgonj, Chawk Bazar, Chittagong, Bangladesh. Tel : 01818-466343, Fax : 880-31

Namo Tassa

বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা

Bangladesh Bouddha Bhikkhu Mahasabha

(The Supreme Buddhist Sangha Council of Bangladesh)
Assembly of Mahasthabir Nikaya
(Affiliated with the world Buddhist Sangha Council)
Estd. 1753

Ref :

Date : 28/02/20

OBJECTS :

To set up .

- A hospital for Monks
- A Bhikkhu Training Centre
- A Meditation Centre.
- A Library & Museum.
- A Tripitak Translation & Publication Centre.
- A fund for physically incapable Monks & Novices.
- A Printing Press
- Arrange scholarships for training and higher education of Monks.
- Work to establish amity world over and discourage [redacted] of nuclear [redacted]

OUR BRANCES :

- **Dharmarajika Bouddha Mahavihar.** Atish Dipankar Sarak, Kamalapur, Dhaka
- **Sudarshan Vihar** Hoarapara, East Guzra Guzra Noapara, Raozan Chittagong.
- **Dharmananda Vihar** Middle Shakpura, Boalkhali, Chittagong.
- **Chandagon Sarbajanin Bouddha Vihar** Chandgaon, Chittagong City
- **Pancharia Gandha kuti Vihar** Pancharia, Patiya, Chittagong.
- **Nandabangsha Int'l Meditation Centre** Bangalhaiya, Rajsthali Rangamati, CHT.
- **Ananda Vihar** Lagnasar, Barura, Comilla.

পাতা-২

স্বনিকায়ের গৃহীদেরও বর্ণিত বিষয় জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভায় বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার আহবান করা হবে। যদি কেউ উক্ত বিষয় অমান্য করে তবে তিনি/তাঁরা অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে দেশীয় আইনে/সংগঠনিক বিধানে দণ্ডপ্রাপ্ত হবেন। বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভায় বর্ণিত একই ধরণের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হলে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

৩. কোন গৃহী/সংগঠন, যে কোন কারণে নিকায় পরিবর্তনে আগ্রহী হলে তাঁর/তাঁদের আগ্রহের বিষয় উভয় ভিক্ষু মহাসভায় বা বলিষ্ঠ ভিক্ষু/গৃহীদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা অনুরূপ সিদ্ধান্ত তাঁদের কার্যকরী সভায় অনুমোদন করলে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

৪. বিনয় সম্পর্কিত কাজ ব্যতিরেখে উভয় নিকায়ের ধর্মীয় ও জাতীয় সকল অনুষ্ঠান সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা অনুরূপ [redacted] হবে।

৫. বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বৃহত্তর কল্যাণে বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার পক্ষে বাদী চন্দনাইশ থানার জোয়ারা গ্রামে অবস্থানরত অধ্যাপক জ্ঞানরত্ন মহাথের ও বিবাদী চান্দগাঁও সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের এর 'চট্টগ্রাম আদালতে বিচারাধীন' মামলাটি এ ঘোষনা পত্র অনুযায়ী বাদীকে বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা মামলাটি প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ/অনুরোধ করার পর মামলাটি প্রত্যাহার হলে উভয় নিকায়ের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় হবে বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা এ প্রত্যাশা করছে।

(সদ্ধর্মরশ্মি রত্নশ্রী মহাথের)
সভাপতি
বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা

(ভদন্ত বোধিমিত্র মহাথের)
মহাসচিব
বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা

ভদন্ত বোধিমিত্র মহাথের
মহাসচিব
বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা
পাঞ্চরিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Mailing Address : Bangladesh Bouddha Bhikkhu Mahasabha, G. P. O. Box No. - 921, Chittagong-4000, Bangladesh.
Head Office Nava Pandit Vihar, 15, Kalidigong, Chawk Bazar, Chittagong, Bangladesh. Tel : 01818-466343, Fax : 880-31-610098

এই ঘটনা অতীতে বহুবার হয়েছিল, বার বার তারা চুক্তি ভঙ্গ করে নতুন শর্ত দিয়ে মিলনকে দুরূহ করে তুলেছেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজে সদ্ধর্ম পুনঃ জাগরনের অগ্রদূত রাজকীয় ত্রিমুকুট উপাধিপ্রাপ্ত মহামান্য সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরো মহোদয়কে সংঘভেদকারী, বর্জ্জিত, পারজিকা প্রাপ্ত, অ-ভিক্ষু এবং তাঁর সৃষ্টি সংঘরাজ নিকায়ের সমস্ত ভিক্ষুই অ-ভিক্ষু বলতে পারে।

সেখানে কিভাবে মিলন হতে পারে। মিলনের পূর্বশর্ত হতে হবে সত্যকে সত্য বলে মেনে নেয়া। মিথ্যাকে সত্য বলে মিলন চাইলে সেই মিলন কখনো সম্ভব হবে না। বুদ্ধের শিক্ষা অনুসারে মিথ্যা পরিহার করে আগে সত্যকে সত্য বলতে শিখুন, তখনি হয়তো একদিন মিলন হবে নয়তো কখনো নয়। ইতিহাসে কোন লেখক অ-ভিক্ষু নামক কোনো শব্দ লিখেছেন কিনা আমার জানা নাই। ইতিহাসে অনেক প্রমাণ আছে যে, নিকায় বিভক্তির আগে ও পরে অনেক সময় অনেকবার বর্তমান যৌথ ঘোষণা পত্রে ন্যায় উভয় নিকায়ের ভিক্ষুরা বিনয় কর্ম ব্যতীত অন্যান্য সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান একসঙ্গে সুসম্পন্ন করার একমত পোষণ করেছিল, কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি।

এখন মিলন চাওয়া মানে অরণ্য রোদন করা। শুধু আমাদের বাংলাদেশে নয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই একাধিক দল-নিকায় রয়েছে। একদিকে মিলন হলে অন্যদিকে আবার ভাঙ্গবে। অন্য দল, উপদল গঠিত হবে, এটায় ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয়। শিকড়কে বাদ দিয়ে যেমন কোন বৃক্ষকে কল্পনা করা যায় না তেমনি অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। কবি বলেছেন;

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছে যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে"।

সুতরাং গুরুজনকে বাদ দিয়ে কেহ মহৎত্বের অধিকারি হতে পারে নি বর্তমানেও গুরুজনকে পেছনে রেখে আমরা কখনো মহৎত্বের অধিকারি হতে পারবো না। বিনয় হচ্ছে বুদ্ধের শাসনের আয়ু, শীল হচ্ছে ভিক্ষু জীবনের অলংকার আমি যতই শিক্ষিত হই না কেন আমার যদি শীল বিনয় না থাকে তাহলে ভিক্ষু জীবন্মৃত। পরিশেষে কবির ভাষায় বলি-

সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।
তাই আমরা একে অপরের পরিপূরক
কেউ কারো পর নয়,
নানা রঙের গাভীরে ভাই, এক রঙের দুধ,
দুনিয়া ঘুরিয়া দেখলাম এক মায়ের পুত ॥

বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র বৌদ্ধ সমাজে আমরা সকলে সকলের আত্মীয়। কেউ কারো পর নয়। তাই রেষারেষী না করে সকলের উচিত পরস্পরের প্রতি মৈত্রী পোষণ করা। কারণ কাদা ছোড়া ছুড়ি সমাজের কল্যাণ বয়ে আনে না, তাই বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের একে-অপরের প্রতিযোগী না হয়ে, সহযোগী হওয়া উচিত এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে সকলের মহৎ মননের পরিচয় দেওয়া উচিত বলে মনে করি।

যারা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই বিরাজমান পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর চেষ্টা করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সফলতা লাভ করতে না পারলেও অন্তত প্রচেষ্টা করার জন্য, কারণ "লাভে লোহা বহে" এতে কার লাভ হয়েছে কার ক্ষতি হয়েছে সেটা আমার পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সেটা আপনারাই নির্ণয় করে নিবেন।

আমার এই ক্ষুদ্র লেখাটি অনুসন্ধিৎসু বৌদ্ধদের সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের পাশাপাশি মননের ক্ষেত্রে তার যোগ্যস্থান করে নিতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করি। সবার প্রজ্ঞাময় জ্ঞান লাভ হউক। জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।

লেখক : **সুমনোপ্রিয় থেরো,** অধ্যক্ষ, পশ্চিম গহিরা শান্তিময় বিহার, রাউজান, চট্টগ্রাম।

কিছু কথা প্রসঙ্গ দু' ভিক্ষু-সংঘ

ড. জিনবোধি ভিক্ষু

'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'- মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ জাতীয় সর্বজনীন, অসম্প্রদায়িক এবং সমস্ত প্রাণীকুলের হিতসুখ কামনা তথা মানব প্রেম ও মানবতার গৌরবগাথা তথাগত বুদ্ধ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বিমুক্ত পুণ্যপুরুষের মুখ থেকে বের হয়েছে এমন নজির নেই। আমরা পিতা-মাতা, জ্ঞাতী-আত্মীয়, ভাই-বোন, পূর্ব-পুরুষের ধন-সম্পদ, ভোগা-ঐশ্বর্য এবং স্বীয় জীবনের মায়া-মোহ ত্যাগ করে বুদ্ধ শিষ্যরূপে দীক্ষিত হয়েছি। তখন থেকে শীল বিশুদ্ধি ও প্রাজ্ঞময়তা জীবনাবলম্বনে শাসন-সদ্ধর্মের প্রচার-প্রসার বিশেষত; আত্মমুক্তি ও মানব সমাজের মুক্তির পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য এ মহান ব্রত গ্রহণ করেছি। তা যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকা মানে সদ্ধর্ম-শাসন সমাজ ও জাতির জন্য দুঃর্ভাগ্য। তাতে আত্মকল্যাণ হবে না পর কল্যাণের প্রশ্নই আসে না বরং আত্মঘাতী হবে, হচ্ছে সন্দেহাতীত ভাবে। বাঙালী বড়ুয়া বৌদ্ধ জাতির সামাজিক এবং ধর্মীয় ইতিহাস যাই বলি না কেন, কোত্থেকে কোথায় এসেছি, কোথায় ছিলাম গৃহী এবং আত্মত্যাগীদের মধ্যে কারো অজানা নেই। পাল শাসনামলে মহাযান তথা তন্ত্র-মন্ত্রযানের আবির্ভাব এবং দ্বাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে অন্ধকারময় যুগ যা কোনো ভাবে অস্বীকার করা যায় না। মূলতঃ বাস্তব সত্য স্বীকার করে নিলে কারোও দোষাবহ হতে পারে না বরং প্রকৃত সত্যের মূল ফুটে উঠে। প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন একটি উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য–

'আশ্বিন মাস আইলে বড়গুয়া হই যায় পাগল,
আইক্যাব অত্তুন ঠাউর আই কিনতে ন দে ছাগল।'

উপরোক্ত উক্তি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বাঙালি বৌদ্ধ সমাজে এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ কিভাবে প্রচলিত ছিল। এর থেকে উদ্ধার এবং রক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালী বড়ুয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কতটুকু ভূমিকা ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ এখানে রয়েছে। আত্মত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বৌদ্ধ প্রধান দেশ মায়ানমার আরাকানে গিয়ে বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করে বঙ্গীয় বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজের সামাজিক এবং ধর্মীয় কুসংস্কার পরিবর্তনে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তারই ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহতভাবে চলছে দাবী করলেও অতীতের সেই দু'ধারা এখন বিরাজমান। একটি প্রাচীন ধারা এবং অন্যটি থেরবাদী পন্থা। যদিও উভয়ে একই পন্থী দাবী করে তা মূলতঃ বাস্তব সত্য নয়। তা যদি সত্য হত তাহলে দ্বিমত বা ভিন্নতা থাকার কথা কি করে আসে? সকলের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ্য যে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজা-রামমোহন রায়, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, রাণী রাজমণি সহ অনেক প্রতীতযশা ব্যক্তিবর্গ প্রাচীন ভারতের বহু কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা বিষয়ে নিজস্ব কর্মদক্ষতা, বুদ্ধি বিবেচনা এবং জ্ঞান শক্তি দিয়ে পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। তাঁদের বাস্তব সংস্কারমুখী কার্যক্রমকে সবাই আন্তরিকতার সাথে মেনে নিয়েছিলেন বলে সমাজ পরিবর্তনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তখন তাদেরকে

দোষারোপ না করে বরং শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের অবদানকে সবাই এখনও মূল্যায়ন করছে। এখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে।

সত্য-সত্য-সত্য প্রকাশে দূর্বলতা কেন? আপন স্বার্থ এবং আপন দল বড় বা শ্রেষ্ঠ দাবী করি তাহলে বুদ্ধশিষ্য এবং বুদ্ধভক্ত হিসেবে বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা (ধর্ম-বিনয়) এবং আদর্শ বা বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেবো নাকি ব্যক্তিস্বার্থ এবং দলকে বড় করে দেখবো? এই বিষয়ে কে, কাকে বোঝাবে? নিজের থেকে নিজেকে বুঝার চেষ্টা যদি না করি। তাহলে কিছু করার নেই। আত্মশুদ্ধি, আত্মসচেতনা, বিবেকের উন্মেষ ও সম্যকজ্ঞান অর্জন নিজস্ব অনুভূতি ও মননশীলতার উপর নির্ভর করে। অতীত ইতিহাস কালের সাক্ষী এবং প্রমাণ দেয় নয় কি? অতীতকে ভুললে চলবে কি? অতীত থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতেই হবে। অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানের সফলতা যেমন নেই ভবিষ্যৎ তেমনি সমৃদ্ধশালী হতে পারে না। নতুবা নিজেকে গর্বিত জাতি হিসেবে পরিচয় দেওয়া যায় না। অতীত মানে যেটা আমাদের চেতনাকে সত্য এবং নীতিবাদে শাণিত করে এবং গৌরবময় ঐতিহ্যকে লালনের শিক্ষা দেয়। এ বিষয়ে আমরা বা আপনারা একেবারে অন্ধকারে আছি নাকি জেনেও না জানার বান করছি? তা যদি বাস্তব সত্য হয়ে থাকে তাহলে যিনি বা যারা নেতৃত্বের আসনে সমাসীন তাদেরকে ক্ষুদ্র স্বার্থ বা সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সমাজ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে। একে অপরকে দোষারোপ বা দায়ী করা সহজ কিন্তু আন্তরিকতা দিয়ে গ্রহণ করা কঠিন। তজ্জন্য প্রয়োজন- পরস্পরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ, আত্মবিশ্বাস এবং তথাগত বুদ্ধের ধর্ম-বিনয়ের প্রতি গারবতা প্রদর্শন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে ষড়তাত্ত্বিক ঋষিদের মধ্যে অন্যতম ঋষি সঞ্জয়বেলটিপুত্রের (যিনি জড়বাদী মতবাদে বিশ্বাসী) কাছ থেকে যখন তাঁর দু'জন প্রিয়শিষ্য সান্নিধ্য ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছিলেন তখন গুরুকে যথার্থ কৃতজ্ঞতা ও গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। যাত্রা পথে তাঁরা দু'জনেই দু'পথে গিয়ে আত্মদর্শন ও আত্মমুক্তির পথ যিনি আগে প্রাপ্ত হবেন একে অপরকে জ্ঞাত করতে হবে উভয়ের মধ্যে প্রতিজ্ঞা ছিল। উভয়ে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে পরবর্তীতে তথাগত বুদ্ধের দু' মহা দিক্‌পাল (অগ্রশ্রাবকদ্বয়- সারিপুত্ত ও মহামোদ্‌গল্যায়ন) হিসেবে বুদ্ধ শাসন-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। তাছাড়াও উরুবিল্লাকশ্যপ, গয়াকশ্যপ এবং নদীকশ্যপ-এ তিনজনই স্ব-স্ব মতবাদে বিশ্বাসী গুরু হিসেবে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু তথাগত বুদ্ধের সংস্পর্শে গিয়ে বুদ্ধের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের স্বীয়মতবাদ পরিবর্তন করে পরবর্তীকালে তিনজনই তথাগত বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, শুধু তা নয় স্বশিষ্যসহ মহান বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বুদ্ধ শাসনের অগ্রগতিতে অনন্য দৃষ্টান্ত রাখতে সক্ষম ছিলেন নয় কি? তাঁরা যদি তাঁদের পূর্বমত পরিত্যাগ করে বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষায় ফিরে আসতে পারেন। তাহলে আমাদের মধ্যে সেই সমস্যা প্রকট হবে কেন? উদাহরণের শেষ নেই। উদাহরণের চেয়ে উদাহরণ তৈরী করাই বড়।

এক হলে সম্মান বেশি নাকি এক থেকে দু' থাকলে সম্মান ও মর্যাদা বেশি। এটাও কে, কাউকে বোঝাবো? এ গুলি যে বুঝি না তা নয়, বুঝে না বুঝার বান করছিনা

তাও বলবো কাকে? আমার মনে হয়েছে অতীতে এবং বর্তমানে পৃথক পৃথক অবস্থান থেকে সরে আসার অনিহা প্রকাশের মূল হল-পদমর্যাদা সংরক্ষণ এবং দ্বিতীয় বিদেশী এবং সরকারীভাবে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি। আমরা আসল ত্যাগী নাকি ত্যাগের নামে নামযশ মুখ্য এ প্রশ্ন কে, কাকে করবে? ব্রহ্মচর্য বা ভিক্ষু জীবন যদি প্রাপ্তির অবলম্বন হয় ঐক্য বা মিলন অসম্ভব। ব্রহ্মচর্য যদি ত্যাগ এবং মুক্তির উপায় বলে গ্রহণ করতে সক্ষম হই তাহলে তৃণ চিড়লে যেমন আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না তদ্রুপ বিনয়গত এবং আদর্শগত মত পার্থক্য নিয়ে যে মতবিরোধ আমরা দেখতে পাচ্ছি মনে করলে তাও তৃণবৎতুল্য। নতুবা হিমালয়ের পাহাড়ের চেয়ে অধিক ব্যবধান হবে বলে মনে হয়। এটাই যদি বড় হয়ে থাকে তাহলে উৎসর্গকৃত জীবন নতুবা পদমর্যাদা এবং সুকৌশলে প্রাপ্তীকে আমরা মনে প্রাণে প্রাধান্য দেবে এতে কোন সন্দেহ নেই। ব্যক্তি বা গোষ্ঠিগত উপভোগ করার চেয়ে সামগ্রিমভাবে উপভোগ আনন্দ ও পরমানন্দের বিষয়ে রূপ নেবে নতুবা ব্রহ্মচর্য জীবনের সার্থকতা কোথায়? ব্রহ্মচর্য বা ভিক্ষুত্ব জীবন মাত্রই উদার, সহিষ্ণু, মান্যতা, ক্ষমাগুণ, গুণগত মূল্যায়ন ও মহত্ত্বতার চেতনায় উজ্জীবিত। তদুপরি আত্মঅহংকার, অহমিকা ও আমিত্বভাব বর্জিত। এ জাতীয় মানবীয় মূল্যবোধ এবং মহৎ গুণের সার্থক ব্রহ্মচারী মাত্রই সর্বস্তরের মানুষের কাছে অতি প্রিয় এবং অতি পূজ্য বলে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। বুদ্ধের নির্দেশিত বাণী হল–সামগ্রিক মিলন সুখকর, সম্মিলিত তপস্যা, আরো অধিকতর সুখকর। এ গুলো সবাইয়ের অন্তরে চির জাগরুক হলে ঐক্যবদ্ধ মিলনবার্তা সুদৃঢ় হয়। সমাজ ও জাতির অগ্রগতি দ্রুততর হবে, এটাই হওয়া জরুরী।

অধুনা মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী এবং অতীতে পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, চট্টগ্রামের পন্ডিত বিহার, কুমিল্লা ময়নামতির শালবন বিহারসহ যা কিছু মুল্যবান প্রত্ন ও স্থাপত্য সম্পদ পাওয়া গেছে তা আর নিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এটাই বাস্তবতা। আমরা আদর্শ এবং বুদ্ধের ধর্ম-বিনয়গত মিলন চাই না উৎসবাদিতে রস বিহীন এবং অন্তরবিহীন মিলনে সমাজ কততুকু সুখী ও আনন্দ পাবে ভাববার বিষয়। সচেতন সমাজ যখন ভূমিকা রাখতে নারাজ তাই হবে। সিদ্ধান্ত দেওয়া কঠিন। এই যদি প্রেক্ষাপট হয় তাহলে তথাগত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরপর প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মহাসংগীতির আদৌ প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। তাঁরা কি মহাসংগীতির আয়োজন করে ভূল করেছিলেন সেদিন? একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আলোকিত জনৈক এক ব্যক্তি বললেন তাদের (সংস্থার) মধ্যে মেধা সম্পন্ন অনেক রয়েছে আর অন্যদের (সংস্থার) মধ্যে মেধার সুযোগ নেই। তার প্রশ্নের জবাবে বললাম, আপনি যথার্থ সত্য কথাই বলেছেন বটে; তবে সেই মেধা সম্পন্নরা স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে হাল ধরে রয়েছেন মাত্র আর অন্যদিকে মেধা শূণ্যরা মেধার পূজা করলে মেধাহীনদের স্থান থাকবে না বলে উভয়ে একই অবস্থায় অবস্থান নিয়েছে বলা যায়। নতুবা মেধাসম্পন্নরা যদি মহাপন্ডিত নাগসেন স্থবিরের ভূমিকায় থাকতেন তাহলে বহু ভাষাবিদ রাজা মিলিন্দকে তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে বুদ্ধ ভাবাপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিভাবে? আমাদের সমাজের অধুনা মেধা সম্পন্নগণ নিরব

কেন? এর মেধা হবে আত্মকেন্দ্রিক। তাদের দ্বারা শাসন-সদ্ধর্ম ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে ভালো কিছু আশা করা বাতুলতা মাত্র।

বুদ্ধ শাসন-সদ্ধর্মের উচ্চাসনে সমাসীন পুণ্যপুরুষদের সরলতা এবং আন্তরিকতার অভাব ছিল না বলে সময়ে সময়ে তাঁরা মনে করছেন যে, সরকারি-বেসরকারি সম্মিলিতভাবে উৎসবাদিতে যোগদান করলে ভক্ত-প্রাণদের মনে আনন্দ এবং ধর্মীয় ভাবাদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও গুরুগত প্রাণ চেতনা আসবে। কিন্তু আয়োজন কারীদের ভেতরে অন্য মনোভাব রয়েছে বিধায় আমরা এক জায়গায় হয়েও এক হতে পারছি না এবং আদৌ সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ হয়? এখন প্রশ্ন মিলনের ব্যাপারে সাধারণ মানুষ দায়ী নাকি যারা নেতৃত্বের মোহে বিভোর তারাই নেতৃত্বের পদমর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য সুকৌশলে সমাজকে দ্বিখন্ডিত করে রেখেছে? আত্মত্যাগী ভিক্ষু-সংঘদের মধ্যে সমন্বয় না ঘটাতে পারলে গৃহী নেতৃত্বদানকারীদের দ্বারা মিলন আদৌ সম্পন্ন করা কোনোদিন সম্ভব নয়। তথাগত বুদ্ধ এবং বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় শিক্ষার প্রতি আমাদের কতটুকু আন্তরিকত শ্রদ্ধাবোধ বিদ্যমান প্রশ্নবিদ্ধ করে নয় কি?

"বাংলার থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম' সম্পর্কে লেখক বাস্তব সত্যের নিরিখে এদেশে বাঙ্গালি বৌদ্ধদের উত্থান-পতন, ধর্মীয় ভাবাদর্শ বিকৃতরূপ এবং ধর্মীয় গুরুদের আচার-আচরণসহ তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিষয়ে নানা তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছেন। আত্মসচেতন, বিবেকবোধ এবং ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি সঠিক তথ্যের মর্মার্থ অনুসন্ধানের যথেষ্ট খোরাক পাবেন এতে।

বর্তমান থেরবাদী বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং ঘটনাবহুল ইতিহাস জনসমক্ষে পুনঃরায় প্রচারাভিযানে এগিয়ে আসার জন্য উদ্যোক্তদ্বয়কে জানাই সাধুবাদ। সহযোগিদেরকে অভিনন্দন ও পুণ্যদান করছি। এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং গ্রন্থের মুললেখককে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের ক্ষুরধার গবেষণা ধর্মী লেখণী প্রজন্মের চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করবে আশা করি। সত্যের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটনে এগিয়ে আসলে সমাজ ও সদ্ধর্মের সেবায় উভয় সংঘ সখ্যতা তৈরীতে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দেবে শুধু তাই নয় বঙ্গীয় বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজে বর্তমান বিরাজমান পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান হবে। অতীতের সেই বীর্যবান, দৃঢ়চেতা, আত্মত্যাগী এবং ধর্ম-বিনয় অনুশীলনকারী পুণ্যপুরুষদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে বর্তমান সময়ে মহাত্মা মনীষী হিসেবে সর্বস্তরের মানুষের অন্তরে ঠাই পাবেন শুধু নয় বরেণ্য এবং প্রাতঃস্মরণীয় অতি মানব হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবেন। উভয় ভিক্ষু-সংঘের মধ্যে সদ্ধর্ম চেতনার উন্মেষের মাধ্যমে প্রজন্ম তাঁদের ভাবাদর্শে সত্য সুন্দরের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে শতধারায় দীপ্তিমান হোক। এটা সময়ের দাবী।

"সত্যমেব জয়তে' অর্থাৎ সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী"।

ড. জিনবোধি ভিক্ষু, প্রফেসর, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং: ০১৮১৮০৯৫৩৭১।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও বিলুপ্তির ইতিহাস

জামাল উদ্দিন

মধ্যযুগে সমতটে বৌদ্ধধর্মের যে বিকাশ ও প্রসার ঘটেছিল সে ইতিহাস আজও অনেকটা তমসাচ্ছন্ন। এর মূল কারণ হল এতদঅঞ্চলের সমসাময়িক আকর ইতিহাসের অভাব। তথাপি ঐতিহাসিক তথ্যের এ শূন্যতা অনেকটাই পূরণ হয়েছে সমসাময়িক সাহিত্য, বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, উৎখননকৃত স্থাপত্যনিদর্শন, শিলালেখ, তাম্রলিপি, ধাতব মুদ্রা, হিন্দু-বৌদ্ধ মূর্তি ও উৎকীর্ণ টেরাকোটা ফলকের মাধ্যমে।

ঐতিহাসিকগণ একমত যে, মধ্যযুগে সমতট ছিল বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল। সমতটের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কারণ, সমতট অঞ্চলে ঘন ঘন ক্ষমতার পালাবদলের ফলে এর রাজনৈতিক সীমারেখা কখনও বর্ধিত ও কখনও সংকুচিত হয়েছে। তবে মোটামুটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এটি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি প্রাচীন ভৌগোলিক অংশ। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (যিনি সপ্তম শতকে বাংলায় পদার্পণ করেছিলেন) এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সে সময় সমতট জনপদ ছিল বাংলায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। সমতটের উত্তর-সীমানা ছিল সিলেট সীমান্তের পর্বত ও হাওর পর্যন্ত; দক্ষিণের সীমানা ছিল হাওর- এর পর থেকে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত; পূর্বদিকে ত্রিপুরা ও আরকানের উচ্চভূমি; পশ্চিমের সীমানা ছিল পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত স্রোতধারা পর্যন্ত।

বৌদ্ধ সূত্র 'বিনয়পিটক থেকে জানা যায় যে গৌতমবুদ্ধ প্রচারকল্পে স্বয়ং পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণে পদার্পণ করেছিলেন। তবে তাঁর এ আগমন ও প্রচারকার্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। ঐতিহাসিকদের মতে, সম্রাট অশোকের শাসন আমলে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বৌদ্ধধর্ম বাংলায় প্রথম প্রবেশ করে। শুঙ্গ ও কুশান যুগেও বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। যদিও গুপ্ত সম্রাটগণ (৩০০-৫৫০ খ্রি:) ছিলেন ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী, তথাপি উদারমনোভাবাপন্ন এ বংশের নৃপতিগণ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল। এ সহানুভূতির ফলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীদের এত নৈকট্য লাভ করেন যে, ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি বুদ্ধদেব বিষ্ণুর একজন অবতার হিসেবে স্বীকৃতি পান। এ কারণে গুপ্ত শাসন আমলে বাংলায় হীনযান ও মহাযান মতবাদ পাশাপাশি প্রসার লাভ করেছিলেন। সমসাময়িক ও পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজকদের (যারা ভারতে এসেছিলেন) বিবরণ থেকে সমগ্র ভারত, বিশেষ করে বাংলার বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থান ও প্রসার সম্বন্ধে জানা যায়। হিউয়েন সাং (৭ম শতক), শেং-চি (৭ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে), ইৎ-সিং (৭ম শতকের শেষার্ধে) প্রমুখের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মৌর্য শাসনামলে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তিভূমি রচনা হয়েছিল।

গুপ্তোত্তর যুগে হর্ষবর্ধনের পর খড়গরা ছিলেন প্রথম বৌদ্ধ রাজবংশ, যারা

সপ্তম-অষ্টম শতকে সমতটে শাসন করেন। খড়গদের শাসনামলে চৈনিক পরিব্রাজক শেং-চি সমতটে ভ্রমণ করেন। সে সময়ে খড়গ বংশীয় রাজভট্ট ছিলেন সমতটের শাসক। তিনি ছিলেন ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) একজন একনিষ্ঠ উপাসক। শেংচির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাজভট্ট প্রতিদিন রাজকার্যের প্রারম্ভে ভিক্ষুদের আর্শীবাদ গ্রহণ করতেন। তিনি বর্ণনা দেন যে, সে সময়ে সমতটে ত্রিশটির মতো বিহার বিদ্যমান ছিল, যেখানে তীর্থে আগত চারশত ভিক্ষু একত্রে আতিথেয়তা গ্রহণ ও অবস্থান করতে পারতেন। সমতটের খড়গ বংশের রাজত্বের পর আরও ছয়টি রাজবংশ যথা- রাত, দেব, দত্ত, চন্দ্র, বর্মণ ও পট্টিকেরা নৃপতিদের শাসন প্রায় পাঁচশত বছর স্থায়ী ছিল। এদের মধ্যে চারজন খড়গ নৃপতির নাম তিনটি তাম্রশাসন থেকে জানা গেছে। দুটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে ঢাকার ৪৭ কি.মি: দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কুমিল্লার আশরাফপুরে অপরটি পাওয়া গেছে ময়নামতিতে। দেলুবাড়ীতে প্রাপ্ত একটি মূর্তির পাদপীঠে খোদিত লিপি ও পূর্বোক্ত তাম্রশাসন থেকে সে নামগুলো পাওয়া গেছে তা হল খড়গদ্যম, জাতখড়গ, দেবখড়গ এবং বলভট্ট। খড়গদের প্রথম রাজধানী ছিল বরকামতা এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় রাজধানী ছিল ময়নামতির রূপবান মুড়ার পশ্চিমে ক্ষীরোদা নদীর তীরবর্তী দেবপর্বতে, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খড়গ বংশের শাসক বলভট্ট। ৭ কুমিল্লার নিকটবর্তী কৈলান গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, রাতবংশের শাসক শ্রীধরণ রাত দেবপর্বতে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। রাতবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নৃপজীবনধরণ রাত। তার দুই উত্তরাধিকারী ছিলেন যথাক্রমে শ্রীধরণ রাত ও বলধরণ রাত। কৈলান তাম্রলিপি দেবপর্বত নগরীকে 'সর্বতোভদ্রক' রীতিতে নির্মিত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ৮ উক্ত নগরীটি ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রের রীতি অনুসরণ করে সম্ভবত দেবপর্বত নগরী নির্মাণ ও সুসজ্জিত করা হয়েছিল। দেবপর্বতের বর্গাকার বা আয়তাকার নকশা এবং প্রধান দিকগুলো নির্দেশ করে চারদিকে চারটি বৃহৎ সুউচ্চ প্রবেশতোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল। বৌদ্ধ বিহারটি অঙ্গনের অভ্যন্তরে প্রধান মন্দিরটির আকৃতি ক্রুশাকার ছিল, যার বাহুর বিস্তৃতি ছিল চারদিকে প্রসারিত।

খড়গদের পরই দেব নামধারী অপর একটি রাজবংশ সমতটে প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিল। তিনটি তাম্রশাসন থেকে দেববংশের নৃপতিদের নাম জানা গেছে। দু'টি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হয়েছে শালবন বিহার থেকে এবং তৃতীয়টি আবিস্কৃত হয়েছে আনন্দ বিহার থেকে, যা এখন কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে। উপরের উল্লিখিত এ দুই বিহার "ময়নামতি এলাকার আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত সবচেয়ে বৃহৎ এবং পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের পূর্বে নির্মিত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আকারের মঠ দালান।" আলোচ্য তিনটি তাম্রলিপি থেকে দেববংশের কয়েকজন শাসকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা হচ্ছেন শ্রী শান্তিদেব, তাঁর পুত্র বীরদেব এবং শ্রী আনন্দ দেব ও তাঁর পুত্র ভবদেব। শালবন বিহারে দেব শাসকগণের নামাঙ্কিত প্রচুর মুদ্রা আবিস্কৃত

হয়েছে, যাতে তাঁরা নিজেদের 'মহান যোদ্ধা' হিসেবে ভূষিত করেছেন। মুদ্রার লিপিসমূহের উপরে ধর্মচক্র প্রতীক দেখা যায়, যার নিম্নে শ্রী 'ভঙ্গাল মৃগাঙ্কস্যায়' কথাটি উৎকীর্ণ, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে তাঁরা খড়গদের ক্ষমতাচ্যুত করে সমতটের দেবপর্বত অধিকার করেন। সম্ভবত দেব নৃপতিগণ খড়গদের এ রাজধানী দখল করার পর এটিকে আরও সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত করেন। কারণ, ময়নামতির সুউচ্চভূমির ১ থেকে ২ কিলোমিটার ব্যাপি প্রসিদ্ধ বিহারগুলো আবিস্কৃত হয়েছে যেমন- শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজবিহার, কুটিলা মুড়া, রূপবান মুড়াসহ বেশকিছু উপাসনালয়। এছাড়া কিছু পার্থিব ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তাকে নৃপতিদের নির্মিত বিহার ও নগর পরিকল্পনার বর্ধিত রূপ বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। আনন্দদেবের নামাঙ্কিত তাম্রলিপি থেকে আরো জানা যায় যে, তিনি তাঁর ৩৯ রাজ্যাঙ্কের পূর্বে সমতটে বসন্তপুর নামের অপর একটি রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন, যা আজও শনাক্তকরণের অপেক্ষায় রয়েছে।

দেববংশের পর সমতটে অপর যে রাজবংশীয় শাসকদের কথা জানা গেছে তা হল দত্তবংশ। চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত কান্তি দেবের তাম্রলিপি থেকে বৌদ্ধ পরিবারের যে প্রজন্মের নাম জানা গেছে তাঁরা হলেন- ভদ্রদত্ত, তাঁর পুত্র ধনদত্ত এবং ধনদত্তের পুত্র কান্তিদেব। কান্তিদেবেরই শুধু রাজকীয় উপাধিসহ নাম পাওয়া গেছে। দত্তবংশ সম্ভবত দেববংশের উত্তরসূরি ছিল এবং তাদের শাসনকাল ছিল অষ্টম শতাব্দীর শেষে। সম্ভবত তাদের রাজধানী ছিল বর্ধমানপুর, যার অবস্থান ছিল সমতটের পূর্বে হরিকেল অঞ্চলে চট্টগ্রাম এলাকায়। যার বর্তমান পরিচিতি দেয়াঙ পাহাড়ের বড়উঠান। দেববংশের পর যে বংশ সমতট এলাকায় একটানা দেড়শত বছর শাসন করে সে বংশ হল চন্দ্রবংশ (আনু. ৯০০-১০৫০ খ্রি:)। বাংলায় গৌরবময় রাজকীয় পাল ও সেনবংশের সাথে তাদের শাসনামলের তুলনা করা হয়ে থাকে। যদিও রোহিতগিরিতে (লালমাই) তারা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তীকালে তারা বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সীগঞ্জে) থেকে প্রতাপের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অধুনা আবিস্কৃত পাঁচটি তাম্রলিপি থেকে চন্দ্র নৃপতিদের নাম জানা গেছে। কালপঞ্জী অনুযায়ী এদের নাম ত্রৈলোক্য চন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণ চন্দ্র, লড়হচন্দ্র এবং গোবিন্দ চন্দ্র। উপরে উল্লিখিত তাম্রলিপিতে তাঁদের দুই পূর্বপুরুষের নাম পাওয়া গেছে, যাঁরা হলেন যথাক্রমে পূর্ণচন্দ্র ও সুবর্ণ চন্দ্র। এ প্রতাপশালী চন্দ্র নৃপতিগণ ক্রমশ আরও শক্তিধর হয়ে সমগ্র সমতটের উত্তর-পূর্বে হরিকেন (সিলেট) এবং দক্ষিণে চন্দ্রদ্বীপে (বরিশাল) তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেন। রাজধানী বিক্রমপুর ব্যতিত দেবপর্বত ছিল তাঁদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। রাজা লড়হচন্দ্র দেবতা লড়হ মাধবের (বিষ্ণু) অনুকূলে কতিপয় ভূমি দান করেন এবং বাসুদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ ঘটনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে যদিও চন্দ্র রাজারা অনুরক্ত বৌদ্ধ ছিলেন তবুও তাঁরা ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

চন্দ্র রাজাদের পর বর্মনগণ সমতটে ক্ষমতায় আসীন হন। তাঁরা ছিলেন

ব্রাহ্মণ্য বংশীয় এবং সম্ভবত তাঁদের উৎপত্তিস্থল ছিল কলিঙ্গ। এ বংশের তিনজন নৃপতির তাম্রশাসন থেকে বর্মন বংশের চারজন নৃপতির নাম জানা গেছে। তাঁরা হলেন জাতবর্মন, হরিবর্মন, শ্যামল বর্মন এবং ভোজবর্মন। আনুমানিক ১০৮০ খ্রি. থেকে ১১৮০ খ্রি. পর্যন্ত ছিল তাদের শাসনামল। পট্টিকেরা সমতটের অপর একটি অঞ্চল ও রাজধানী ছিল, যা দেবপর্বতের প্রান্তদেশে অবস্থিত ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ প্রায় মতৈক্যে পৌঁছে গেছেন। হরিকেলদেবের একটি তাম্রলিপি থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাজা হরিকেলদেব পট্টিকেরার শাসক এবং রাজধানী পট্টিকেরা থেকে (১২২০ খ্রি:) তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। পট্টিকেরার এ শাসকগণ বহু দুর্গ ও বিহার দ্বারা তাঁদের রাজধানী সুসজ্জিত করেছিলেন। এ তাম্রলিপিটির তারিখ ইংরেজিতে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় ১২২০ খ্রিষ্টাব্দ। ময়নামতিতে প্রাপ্ত (উৎখননিত) বহু রৌপ্য মুদ্রায় পট্টিকেরা লিপি এবং বৃষ ও ত্রিরত্ন প্রতীক দেখা যায়। মুদ্রা পাঠ ও বিশ্লেষণ করে সমতটের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এতদঅঞ্চলে সাতটি রাজ বংশের উত্থান-পতনের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী উভয় শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে বৌদ্ধধর্মের এক শক্ত ভিত্তি গড়ে উঠেছিল যা পরবর্তীকালে সেন শাসক এবং মুসলিম শাসকদের আগ্রাসনের ফলে প্রায় বিলুপ্ত হয়।

বিশ শতকের প্রারম্ভে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে সমতটে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির এক লীলাভূমির উন্মোচন ঘটে এবং পর্যায়ক্রমে আজ পর্যন্ত যে অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ হচ্ছে। সেখানে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্য যথা- বিহার, মন্দির, রাজপ্রাসাদ, দুর্গ এবং মাটির নিচ থেকে উৎখননিত মূর্তির, তাম্রশাসন, মুদ্রা, ব্যবহার্য তৈজসপত্র ও উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলক মধ্যযুগে সমতট বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের সাক্ষ্য আজও বহন করে চলছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশ যুগে এতদঅঞ্চলে ১৭৫৭ সালে প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন শুরু হয়েছিল এবং তা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ভারতবর্ষ বিভাগোত্তর যুগে এ অঞ্চলে পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর পর্যায়ক্রমে ধীর গতিতে উৎখনন কাজ চালাতে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করার পর থেকে ময়নামতি দেবপর্বত অঞ্চলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উৎখনন কার্য বিরামহীনভাবে চলছে এবং এ পর্যন্ত বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে যার পঠন-পাঠন আজও চলছে। ১৯৯৫ সালে ১২ মার্চ ময়নামতির ভোজবিহারে যে অনিন্দ্যসুন্দর বজ্রসত্ত্বের ব্রোঞ্জ মূর্তিটি আবিস্কৃত হয়েছে তা এশিয়ায় প্রাপ্ত অপরাপর ব্রোঞ্জ বজ্রসত্ত্ব মূর্তির চাইতেও বিশাল। মূর্তিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এর অনুপম সৌন্দর্য, মূর্তি-লক্ষণ ও ভাস্কর্যের শৈলী বিচার করে মূর্তি বিশারদ গৌরেশ্বর ভট্টাচার্য্য এবং প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ এম. হারুনুর রশিদ আলোচ্য বজ্রসত্ত্ব মূর্তিটি নির্মাণ তারিখ একাদশ শতক বলে নির্ণয় করেছেন এবং এটি একটি আদিবুদ্ধের মূর্তি, যাকে 'পঞ্চ তথাগতের" গুরু হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। বর্তমানে এ বিখ্যাত মূর্তিটি ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে (ACC No. 1165)।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক যুগ থেকে অধুনা বাংলাদেশে ময়নামতি দেবপর্বত এলাকায় উৎখননের ফলে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চল (সাইট) উন্মোচিত হয়েছে তাতে যে সকল বিহার, মন্দির উপাসনালয় (৮ম থেকে ১২ শতক) বিখ্যাত তার মধ্যে রয়েছে শালবন বিহার, যাকে 'শালবন রাজার প্রাসাদ' বলা হত। এরই একটি ক্ষুদ্র উপাসনালয়ে (Chapel) চন্দ্রবংশের রাণী ময়নামতি ও তাঁর পুত্রের গুরু হরিপা (hadip-pa) অবস্থান করতেন বলে জানা গেছে। অপরাপর স্থাপনার মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন রাত নৃপতিদের আমলে নির্মিত কুটিলা মুড়া (৭ম শতকের শেষার্ধ), যার অবস্থান ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে এলাকার তিন মাইল উত্তরে। কুটিলা মুড়ার মন্দিরের স্থাপত্যিক ভূমি নকশায় ত্রিরত্ন প্রতীকের প্রতিফলন লক্ষণীয়, যা 'বুদ্ধ-ধর্ম ও সংঘ' নির্দেশ করে। ময়নামতিতে আবিস্কৃত চরপত্রমুড়া (১০ম শতক) ময়নামতির ২০০ ফুট পাহাড়ি এলাকায় বিস্তৃত। এর উচ্চতা ৩৫ ফুট। ১৯৫৬ সালে এটি আবিস্কৃত হয়। এতে প্রদক্ষিণ পথসহ ডিম্বাকৃতির একটি দেবালয়ের ভগ্নপ্রায় স্থাপনা রয়েছে। এখানেই চারটি বিখ্যাত উৎকীর্ণ লিপিসহ তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এছাড়া ইটাখোলা মুড়ার আরও প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গেছে।

ময়নামতিতে যে সকল তাম্রশাসন ও মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গেছে তার সংখ্যা ১২টি। এর সাতটি শালবন বিহার, চারটি চরপত্রমুড়া এবং একটি ইটাখোলা মুড়ায় পাওয়া গেছে। ইটাখোলা মুড়ার তাম্রলিপিটির তারিখ সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ তাম্রলিপির ভাষা সংস্কৃত, প্রাচ্যব্রহ্মী এবং প্রটো-বাংলা যা খড়গ, দেব, চন্দ্র ও পরবর্তী দেবদের শাসন আমলে কৃত। ময়নামতি দেবপর্বতে যেসব ধাতব মুদ্রা (স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি) আবিস্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে তা সমতটের ইতিহাস বিনির্মাণে আজও বিরাট ভূমিকা পালন করে চলছে।

আলোচ্য অঞ্চলে আবিস্কৃত বেশ কিছু পাথর, ব্রোঞ্জ, স্টাকো (stucco) ও টেরাকোটায় (terracotta) নির্মিত হিন্দু-বৌদ্ধ মূর্তি এবং মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির ফলক ময়নামতির প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর এবং দেশ-বিদেশে অপরাপর জাদুঘর ও সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে তাতে সমতটে বৌদ্ধধর্মের বিশালত ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের একে অপরকে প্রভাবিত করার প্রবণতা লক্ষণীয়। এতদঅঞ্চলের যে ব্রোঞ্জ নির্মিত পদ্মপাণি, ধ্যানীবুদ্ধ, অমিতাভ, বজ্রসত্ত্ব, অক্ষোভ, মঞ্জুশ্রী, জাম্বাল, শ্যামতারা ইত্যাদির মূর্তি পাওয়া গেছে তাতে বাংলার বিশেষ ভাস্কর্য শৈলী লক্ষণীয়। যেমন মূর্তির সুউচ্চ পাদপীঠ, বিশ্বপদ্ম আসন, প্রভাবলী ইত্যাদি।

সপ্তদশ শতকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শিক্ষক লামা তারানাথ, কর্তৃক রচিত 'ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস' (১৬০৪) থেকে জানা যায় যে, বাংলায় পাল মহাজানী নৃপতিদের শাসন আমলে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার শিল্পীরা নবম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অনিন্দ্যসুন্দর তন্ত্রযানী-বজ্রযানী দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ করতেন।

তিনি আরো মন্তব্য করনে যে, ধর্মপাল ও দেব পালের শাসন আমলে বঙ্গে ধীমান ও তাঁর পুত্র বীটপাল পূর্ব দেশীয় ধাতুমূর্তির রীতি প্রচলনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তবে চিত্রকর পিতা ধীমান যে রীতি প্রচলন করেন তাকে 'পূর্ব দেশীয়' রীতি বলা হত। আর পুত্রের রীতি ছিল 'মধ্য দেশীয়' অর্থাৎ মগধে, যা বর্তমানে দক্ষিণ বিহার অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা যায়। ধীমান ও বীটপাল ব্যতিত বাংলায় আরও কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন তাঁরা হলেন রণকশুলপানী, জয়, প্রজ্জয় এবং বিজয়। মধ্যযুগে বাংলার এ শিল্পকলার রীতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল নেপাল, মায়ানমার (বার্মা), সিংহল, (সিলন) ও ইন্দোনেশিয়ায়।

সমতটে ময়নামতির শালবন বিহারে উৎখননকৃত ও মন্দিরসমূহের গাত্রে যে পোড়ামাটির ফলক রয়েছে তাতে নানা বিষয়ে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য দেখা যায়। বৌদ্ধ মন্দিরের দেয়াল গাত্রের ফলকগুলোতে (হিন্দু, বৌদ্ধ) ধর্মীয় কাহিনী এবং জনজীবনের চিত্র বিধৃত। হিন্দু বিষয়ের মধ্যে উড়ন্ত কিন্নর-কিন্নরী, গন্দর্ভ ও বিদ্যাধর। এছাড়া রয়েছে সিংহ, হাতি, হরিণ ও ঘোড়ার নতোন্নত ভাস্কর্য (relief)। মালাঠোঁটে হংসরাজ বিষয়টি বৌদ্ধধর্মে জাতকের কাহিনী থেকে নীত। বৌদ্ধধর্মের প্রতীক হিসেবে এখানে গুরুত্ব পেয়েছে সিংহ, হরিণ ইত্যাদি।

ইট দ্বারা নির্মিত বিহার, মন্দির ও অপরাপর স্থাপনায় ইটের নানাবিধ নকশা ও পোড়ামাটির অলংকরণ দ্বারা সুসজ্জিত ছিল, যা ভারতের নালন্দা মহাবিহার ও বাংলাদেশের মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুরের বৌদ্ধ স্থাপনা ও শিল্পকলার আন্তমিলের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সমতটের এই মূল চালিকাশক্তি ছিল বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি।

আশ্রয়স্থল চট্টগ্রাম পণ্ডিত বিহার

খ্রিষ্টীয় একাদশ শতক থেকে বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিষ্ঠুর অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে স্বীয় প্রাণ ও ধর্ম রক্ষার্থে আরাকান শাসনাধীন চট্টগ্রামের এসে শেষ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। তার কারণ ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানের বৌদ্ধ রাজাগণ চট্টগ্রাম শাসন করেছেন। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে তখন চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যভূক্ত ছিল। যে কারণে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সমাজ ও বৌদ্ধ স্থাপনাগুলাতে হিন্দু ব্রাহ্মণরা কিংবা তুর্কী মুসলিমরা তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাই পলাতক ভিক্ষুদের অধিকাংশ আশ্রয় নিয়েছিলন চট্টগ্রাম পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে চট্টগ্রাম পণ্ডিতবিহার বিশ্ববিদ্যালয় অনন্য এক বিহার হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে।

চট্টগ্রাম পণ্ডিতবিহার বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ত্রয়োদশ শতকে সেনরাজবংশের শাসনামলে (১১০০-১২৬০ খ্রিস্টাব্দে) এ সময়কালে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো নানা রাজনৈতিক দুর্যোগের কারণে ব্যাপকহারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। সেন ও বর্মন রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরূপ। তাদের শাসনামলে বৌদ্ধদের উপহাস ও বিদ্রুপ করা হতো এবং

ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদেরকে পাষণ্ডী ও নাস্তিক বলে নিন্দা করতো। বৌদ্ধ বিহারগুলোতে বুদ্ধ, বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি সরিয়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'শংকর বিজয় ও শুন্য পুরান' গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের বৌদ্ধ নির্যাতনের বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। শুন্য পুরাণ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের বিষয় সম্পত্তি কেড়ে নিত এবং তাদের সর্বদা অত্যাচার নির্যাতন করত। বৌদ্ধ বিহারগুলো হিন্দু ব্রাহ্মণদের দখলে চলে যায় এবং বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। এছাড়া অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু দেশ ত্যাগ করে তিব্বত, নেপাল, উড়িষ্যা, কামরূপ, আরকন ইত্যাদি অঞ্চলের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। এ সমস্ত কারণে বৌদ্ধধর্ম ত্রয়োদশ শতকের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বলতে গেলে বাংলায় তখন সেনবংশের নিয়ন্ত্রণাধীন হিন্দু রাজত্বের রমরমা অবস্থা।

লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলা আক্রমণ করেন। এ আক্রমণে বাংলায় অবশিষ্ট বৌদ্ধ সভ্যতার যা ছিল তাও সমূলে উৎপাটন হয়ে গেল। ভাগ্যান্বেষণে আগত তুর্কীবীর বখতিয়ার বৌদ্ধবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মনে করেছিলেন ব্রাহ্মণদের দুর্গ। এ ভ্রান্ত ধারণায় বাংলার বৌদ্ধবিহার, সংঘারাম ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বখতিয়ারের তরবারি ও অশ্বক্ষুরের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। বিহারভিত্তিক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে নালন্দা, বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী মহাবিহারগুলো একেবারে নিচিহ্ন হয়ে গেল, নিহত হল অধিকাংশ বৌদ্ধ ভিক্ষু। বিহারে রক্ষিত ধন-সম্পদ লুট করা হল। আগুনে পুড়ে সবকিছুই ছাই হয়ে যাবার পর বখতিয়ার খিলজী জানতে পারলেন এগুলো ব্রাহ্মণদের দুর্গ নয়, এগুলো সুসমৃদ্ধ বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়। এভাবে তুর্কী সৈন্যদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেল বাংলার হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপনা। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন- যাঁরা তুর্কী বীরদের অস্ত্রাঘাত হতে কোনরকমে প্রাণে বাঁচতে সক্ষম হলেন তাঁরা অতিকষ্টে হাতের কাছে পাওয়া কয়েকটি পুথি, ছোট ছোট মূর্তি প্রতিমা এবং সূত্রোৎকীর্ণ মাটি বা শিলাফলক নিয়ে পালিয়ে গেলেন তিব্বত, নেপাল, উড়িষ্যা, কামরূপ, আরাকান, পেঁগু, পগান বা আরও দূরদেশে। একই প্রসঙ্গে নলিনীনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন- মগধের বিহারগুলোতে তুর্কীদের এরূপ জঘন্যতম অত্যাচার কাহিনী শুনে বাংলার সোমপুর, জগদ্দল প্রভৃতি বিহারবাসী শ্রমণগণ অত্যাবশ্যকীয় কিছু পুথিপত্র সঙ্গে নিয়ে আত্মরক্ষার্থে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন- দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে তুর্কী মুসলমানদের আক্রমণে প্রথমে মগধ ও পরে ভারতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বাংলার বৌদ্ধ বিহার ও সংঘরামগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বৌদ্ধধর্ম গ্রাস করার ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে তুর্কী মুসলমানদের আক্রমণে প্রতিকূল শক্তির মোকাবেলায় বিধ্বস্ত বৌদ্ধধর্ম বাংলা থেকে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেল।

বাংলার সুলতানী আমলে ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে ফকর উদ্দিন মোবারক শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় এবং চট্টগ্রামে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। তখন থেকে ১৫৮০

খ্রিস্টাব্দে জামাল খাঁ পন্নীর সময়কাল চট্টগ্রামে মুসলিম শাসন বলবৎ ছিল। সুলতানী আমলে চট্টগ্রাম মুসলিম অধিকারে চলে আসলে চট্টগ্রামেও বৌদ্ধরা নির্যাতিত হতে থাকে। হয়তো এ সময়ে চট্টগ্রাম পণ্ডিতবিহারও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি এবং এ সময়েই চট্টগ্রাম পণ্ডিতবিহার থেকে ভিক্ষুরা দলে দলে তিব্বত, নেপালের দিকে ছুটে যেতে থাকে। পরবর্তীতে ১৬৬৬ খিস্টাব্দে মোগলরা আরাকান রাজকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম দখল করে নেয়। চট্টগ্রাম দখলের এ ভয়াবহ যুদ্ধে চট্টগ্রাম পণ্ডিতবিহার সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় বলে ধারণা করা যায়। এ যুদ্ধে চট্টগ্রাম পণ্ডিতবিহার ধ্বংস, ধর্মগ্রন্থ বিনষ্ট, বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ নিহত হন বা পলায়ন করেন। চট্টগ্রাম থেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা (মগরা) পালিয়ে আরাকানে আশ্রয় নেয়। অবশিষ্ট বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর নেমে আসে অমানিশার যুগ। মোগল সম্রাট বা শাসকরা এদেশে বৌদ্ধধর্ম নামে কোন ধর্ম ছিল, মনে হয় তা জানতেনই না। কারণ মোগল শাসনামলের কোন পুঁথিপত্র বা গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম বা বৌদ্ধদের কোন কথা পাওয়া যায় না। সত্যিকার অর্থে তখন বাংলায় বৌদ্ধদের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

শিহাব উদ্দিন তালিশ বিরচিত "ফতিয়া-ই-ইব্রিয়া" গ্রন্থে, দেয়াঙ পাহাড়স্থ প্রাচীন চট্টগ্রাম বন্দর, দেয়াঙ কারাগার, বদরশাহের দরগাহসহ মোগল-আরকানীদের ভয়াবহ যুদ্ধের বর্ণনা থাকলেও পণ্ডিত বিহার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তাতে ধারণা করা হয় যে, পণ্ডিতবিহারের সেই জৌলুস তখন ছিল না।

চট্টগ্রামের কৃতীসন্তান পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে কয়েকবার তিব্বতে গিয়ে প্রাচীন পুঁথিপত্র এনে ব্যাপক গবেষণা করেও চট্টগ্রাম পণ্ডিতবিহারের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারেন নি। তবে তিনি চট্টগ্রাম শহরের দেবপাহাড় এলাকায় এর অবস্থান ছিল বলে মনে করেন। পরবর্তীকালে বিশ্ববিশ্রুত বৌদ্ধ মনীষী ড. বেণীমাধব বড়ুয়া ও আইনজীবী উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দী প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালান। তাঁরা মনে করেন এর অবস্থান আন্দরকিল্লার রংমহল পাহাড় এলাকায়। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে এর অবস্থান ছিল পটিয়ার চক্রশালায়। তবে অধিকাংশ গবেষকদের অভিমত এ যে, বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান ছিল কর্ণফুলীর দক্ষিণ তীরবর্তী দেয়াঙ পাহাড়ে। যেখানে দনুজমর্দন দেব, মধুসূদন, বাসুদেব, রাজা কান্তিদেব প্রমুখ দেববংশীয় রাজারা রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এখানে ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেববংশীয় রাজাদের রাজধানীর অস্তিত্ব ছিল। দেয়াঙ পাহাড়স্থ তাদের রাজধানীর নাম বড়উঠান।

বড় উঠানের অনতিদূরেই ঝিওরী ও হাজিগাঁও গ্রাম। দেয়াঙ পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এ দু'গ্রামের সীমানা থেকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আবিষ্কৃত হয় ৬৬টি বুদ্ধমূর্তি। ঝিওরী গ্রাম থেকে দু'মাইল উত্তরে খিলপাড়া ও কৈনপুরা গ্রামে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আরও কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। এ মূর্তিগুলোই ইতিহাসবিদদের সামনে পণ্ডিতবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানস্থল যে

দেয়াঙ পাহাড় তার প্রমাণ অনেকাংশে নিশ্চিত করে দেয়।

অন্ধকার যুগে বৌদ্ধ সম্প্রদায়

বাংলাদেশে এককালে এক কোটির অধিক বৌদ্ধ ও সাড়ে এগার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করত বলে পণ্ডিতরা ধারণা করেন। সেন আমল, তুর্কী শাসনামল ও পরবর্তীতে সুলতানী আমলে এ দেশে বৌদ্ধদের বিনাশ পর্ব চলে।

সেই অন্ধকার যুগে বৌদ্ধদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার ছিল দারুন ভাবে উপেক্ষিত ভিক্ষুসংঘ ও সংঘরাম এবং ধর্মীয় গ্রন্থ বিলুপ্তিতে তারা ভুলে গিয়েছিল ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি। শুধু রয়ে গিয়েছিল এক টুকরো গৈরিক বসন। তা দিয়েই তারা ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও পূজা-পার্বণ সম্পাদন করত। তখন তাদের রাউলি নামে ডাকা হত। রাউলিরা ছিল বিবাহিত। এসব বিবাহিত বৌদ্ধ পুরেহিতরা নিজের মত করে বৌদ্ধধর্ম গড়ে তুলেছিল। এ সময় বৌদ্ধ সমাজে 'মঘা খমুজা' নামক একটি ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে রাউলিরা ধর্মীয় কাজ পরিচালনা করতো। অন্যদিকে বৌদ্ধ গৃহীসমাজে কালী পূজা, দূর্গাপূজা, মনসাপূজা, কার্তিক পূজা, শনি পূজা, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি হিন্দু ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান প্রচলন শুরু হয়ে যায়। আবার মুসলমানদের মানিকপীরের সিন্নী, সত্যপীরের সিন্নী, বদর শাহের সিন্নী, মির্জির সিন্নী ইত্যাদিও বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলন ছিল। মা মগধেশ্বরীর নামেও সেবাখোলায় পূজা ও বলিদান প্রথা বৌদ্ধদের মধ্যে বহু আগে থেকেই প্রচলন ছিল। বৃহত্তর চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ গৃহীরা তখন এরূপ অবৌদ্ধসম্মত অবস্থার মধ্যে না হিন্দু, না বৌদ্ধ, না মুসলমান হয়ে জীবন যাপন করছিল।]

এ প্রসঙ্গে রাখাল দাস বলেছেন- 'অধঃপতন আরম্ভ হইলে সভ্যমানব স্থম্ভিত হইয়া থাকে। অনেক সময় আত্মরক্ষার জন্য হস্তোত্তোলন তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন আর ইতিহাস রচিত হয় না।' ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দের পর বৌদ্ধদেরও ইতিহসা আর রচিত হয়নি। এ সময় গোবিন্দ পালের রাজ্য-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র মগধের পতন হয়। ওদন্তপুর ও বিক্রমশীলা অধিকৃত হয়। যে বিশ্ববিদ্যালয় অন্ধকার যুগে সমগ্র বিশ্বকে আলো দিয়েছে, চীনসহ সমগ্র এশিয়া খণ্ডকে মৈত্রীপাশে আবদ্ধ করেছে ও সাঙ্গীকরণ নীতি অনুসরণ করে সকলকে একসাথে নিয়ে ভেদাভেদের উর্ধ্বে নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছে, সেই নালন্দা ধ্বংস হল, নালন্দা ও ওদন্তপুরীর সঞ্চিত হাজার হাজার বই ভস্মীভূত হল, শুরু হল তমসাচ্ছন্ন যুগের। ১৩০০ থেকে ১৮০০ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কি হল তা আর জানা নেই। আবিস্কৃত প্রত্নতত্ত্বের জোড়াতালির ইতিহাস থেকে আভাস পাওয়া যায়, এ সময়ের মধ্যে সঙ্ঘারাম জনশূন্য হয়েছে, পরিচয় হারিয়েছে, অবলুপ্ত হয়েছে আর পৃষ্ঠপোষকহীন বিশাল বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, শাক্ত ও ইসলাম কবলিত হয়েছে। অনেকে বুদ্ধকে ধর্মঠাকুর হিসেবে পূজা করে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হিসেবে দিন কাটিয়েছে, আর যারা কিছুই করতে পারল না,

তারা প্রবল ব্রাহ্মণ্য বিরোধিতার মুখে উপাস্য হারিয়ে অস্পৃশ্য শুদ্র জাতিতে (হরিজন) পরিণত হয়েছে। এই ভূ-ভারত থেকে বৌদ্ধ বিলীন হয়ে যাওয়ার আভাস। তারপর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়ে নতুন আরেক অধ্যায়। এ অধ্যায়ের ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, ইংরেজ সন্ধানীরা এল, শুরু হল খনন কার্য, আবিস্কৃত হল অতীতের স্মৃতিবাহী কত মন্দির, কত ধ্বংসাবশেষ, কত প্রস্তর মূর্তি, প্রাচীন পাত্রে আঁকা কত ছবি-অজন্তা। ইলোরা শুরু হল ভারত-মানসের অনুসন্ধান। অশোকের শিলালিপি এল মানুষের সামনে, পাঠ উদ্ধার হল, জানা গেল ভারতে এক সভ্যতা ছিল, এ সভ্যতা অনুপম। জেমস প্রিন্সেপ, এডুইন আর্নল্ড বৌদ্ধ বিজ্ঞানী ইংরেজ পণ্ডিত রিস ডেভিডস প্রমুখ গবেষক ও চিন্তাবিদগণ ভারতকে দিলেন এক নতুন চমক। কবি আর্নণ্ড লিখেছেন, 'দি লাইট অব এশিয়া'। বুদ্ধের বিপুল বিস্তৃতির খবর দিল নেপাল, তিব্বত, জাপান, শ্রীলংকা, বার্মা, শ্যাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ। এর প্রভাবে বাংলায়ও বুদ্ধ চেতনা শুরু হল, প্রতীচ্য শিক্ষার উদারতায় এগিয়ে এল রাজেন্দ্র লাল মিত্র, বঙ্কিম প্রমুখ মনীষীগণ।

চট্টগ্রামে যেভাবে পুনরুত্থান হল বৌদ্ধধর্ম

এ ধারা ব্রিটিশ শাসনামলের শেষদিকেও প্রচলিত ছিল। **চট্টগ্রামী বৌদ্ধদের মধ্যে যখন এ অবস্থা চলছিল এমন সময় আরাকানী থেরবাদী ভিক্ষু সারমেধ মহোদয়ের আগমন ঘটে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাধাচরণ মহাস্থবিরের সাথে বুদ্ধগয়া থেকে চট্টগ্রাম পরিদর্শন করতে এলে এখানকার বৌদ্ধধর্মের অবস্থা, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্ম বিনয় সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের রীতিনীতির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেন। তিনি দু' বছর চট্টগ্রামে অবস্থান করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মবিনয় সম্পর্কে নতুনভাবে জ্ঞান দান করেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে সারমেধ প্রয়োজনীয় ভিক্ষু সংঘসহ দ্বিতীয়বার চট্টগ্রামে আগমন করে হীনযান মহাযান মিশ্রিত চট্টগ্রামের রাউলি পুরোহিতগণকে সর্বপ্রথম থেরবাদসম্মত বিনয়বিধান মতে উপসম্পদা প্রদান করেন। একই সালে চট্টগ্রামের সন্তান আচার্য পূর্ণাচার বার্মার সংঘরাজের নিকট থেকে নতুনভাবে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। একই সাথে চট্টগ্রামের সন্তান আচার্য পূর্ণাচার বার্মার সংঘরাজের নিকট থেকে নতুনভাবে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে এসে সংঘরাজ সারমেধ মহোদয়ের সাথে মিলিত হয়ে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। সেই থেকে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদের আবার এ দেশে পথচলা শুরু হয়।**

(৫) সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং প্রকাশিত দৈনিক আজাদী হতে সংকলিত।